# ইলম ও উলামায়ে কেরামের গুরুত্ব এবং উলামায়ে হক চেনার মানদণ্ড

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

*৬ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদপুরের বসিলা গার্ডেন সিটিতে অবস্থিত উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার সালানা জলসায় প্রদত্ত বয়ান।*

হামদ ও সালাতের পর....

**মাদরাসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**

অনেকে বলে, মাদরাসার সংখ্যা বেশী হয়ে যাচ্ছে। কথাটা সঠিক নয়। প্রত্যেক মহল্লায় একটি দীনী মাদরাসা থাকা ফরযে কিফায়া। বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে; কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে দীনী মাদরাসা নেই। সে হিসাবে এখনো লক্ষ লক্ষ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

আমরা আল্লাহ তা'আলার গোলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মালিক। মালিকের গোলামী কিভাবে করতে হয়, মালিক আমাদেরকে কী কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কি কি দায়িত্ব দিয়েছেন– এগুলো পরিপূর্ণভাবে একমাত্র মাদরাসার মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বেহেশতী যেওরে লিখেছেন, ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা যায় এ ধরনের মাদরাসা প্রত্যেক মহল্লায় থাকা ফরযে কিফায়া। অন্যথায় মহল্লার সকলেই গুনাহগার হবে।

বর্তমানের কওমী মাদরাসাগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। দীনী প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পাশাপাশি এসব মাদরাসা দ্বারা দুনিয়াবী অনেক প্রয়োজনও পূরণ হচ্ছে। এমনকি দেশের সরকারও অনেকভাবে লাভবান হচ্ছে।

প্রথমত, সরকারের একটি উদ্যোগ হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ। কওমী মাদরাসা দ্বারা লক্ষ লক্ষ ছেলে শিক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, কওমী মাদরাসাগুলোতে ধনী ছেলেদের পাশাপাশি অনেক গরীব ছেলেও লেখাপড়া করে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করে বড় বড় আলেম বানিয়ে দিচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এরা নিজেরা প্রকৃত মানুষ হয়ে অন্যদেরকেও সভ্য মানুষ বানাচ্ছে। এসব ছেলে লেখাপড়া শিখে আলেম না হলে–আল্লাহ না করুন–অভাবের তাড়নায় দেশের মধ্যে বহু বিশৃংখলা সৃষ্টি করত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হত।

তৃতীয়ত, কওমী মাদরাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থী জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় দীনের খেদমত করছে। তাদের পাঠানো ডলার-রিয়াল-ইয়ান প্রভৃতি দ্বারা সরকারের রিজার্ভ বাড়ছে। দুনিয়াবী ব্যাপারে এগুলো ছাড়াও কওমী মাদরাসার আরো বহু অবদান রয়েছে। অথচ তাদের পেছনে সরকারের একপয়সাও খরচ করার প্রয়োজন পড়ে না।

**দীনী ইলম না থাকার ফল**

প্রয়োজনীয় দীনী ইলম না থাকলে সমাজের সর্বস্তরেই চরম অবক্ষয় নেমে আসে। জনগণ ও সরকার কেউই এ অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকে না। মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিও তখন লোপ পায়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত-

**এক.** কয়েক মাস পূর্বে সরকার এক যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে এসেছিল। সৌদি সরকার সেটাকে নাকি নাগরিকত্ব দিয়েছে। সেই যান্ত্রিক মানুষকে সরকার আমাদের দেশে নিয়ে এসে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এই সম্পদগুলো জনগণের কোন স্বার্থে ব্যয় করা হল? কে কার নিকট হিসাব তলব করবে? কোন জবাবদিহিতা নেই। অথচ আমরা বিদেশীদের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণী হয়ে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

**দুই.** বিগত কয়েক মাস পূর্বে আমাদের দেশে শান্তির বাণী নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ এসেছিল। আসলে শান্তির বাণী নয়, গজবের বাণী নিয়ে এসেছিল। তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোটি কোটি সরকারী টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একযামানায় রাষ্ট্র পরিচালকগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদের মত খরচ করবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২২১০)

বর্তমানে এই দৃশ্যই সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের সম্পদ; জনগণের স্বার্থেই তা ব্যয় করতে হবে। তাহলে খ্রিস্টান ধর্মগুরু-পোপের জন্য কোটি কোটি টাকা কার স্বার্থে, কোন অধিকারে ব্যয় করা হল?!

**তিন.** আরাকানী মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমানদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত। (এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, শ্রীলঙ্কা) আরাকানী মুসলমানদের বসবাসরত স্থানটিতে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। ঈমানের বদৌলতে মাটিও সোনা হয়ে যায়। কাফের রাষ্ট্রগুলো এই খনিজ সম্পদ পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে আরাকানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। সারা দুনিয়ার কাফের রাষ্ট্রগুলো পরিকল্পিতভাবে সম্মিলিত সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছে যে, কোন দেশ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করবে, তখন কোন দেশ পক্ষে থাকবে আর কোন দেশ সমালোচনা করবে যাতে মুসলমানরা গোপন রহস্য বুঝতে না পারে।

আমরা বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলাম, মিয়ানমার সরকারের সাথে নমনীয়তার প্রয়োজন নেই। আরাকানী মুসলমানদেরকে ইজ্জতের সাথে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেয়া হোক। অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে স্থায়ী করে নাগরিকত্ব দেয়া হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা রাষ্ট্র বানানোর জন্য খ্রিস্টান মিশনারীগুলো বহু বছর যাবত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা উপজাতিদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে দল ভারি করছে। আমি ১৯৮৬ সালে একটি বই লিখেছিলাম। সে বইয়ে উল্লেখ করেছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভিন্ন রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারা চলছে। আরবের বুকে ইসরাইল যেমন বিষফোঁড়া তেমনই

হবে বাংলাদেশের বুকে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ২০০৬ সালের দিকে সেনাবাহিনী মন্তব্য করল, পার্বত্য চট্টগ্রামে এন.জি.ও.দের আনাগোনা বহুগুণে বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাদের ভিন্ন কোন প্লান আছে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তারা সরকারকেও সতর্ক করেছিল। কিন্তু সরকারের কার্যকলাপে সতর্ক হওয়ার আলামত দেখা যায় না।

জনগণের মাঝে দীনী ইলম না থাকার ফলে যে সব অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**এক.** স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে লেখাপড়া করলে ডক্টর-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়; কিন্তু দীনী ইলম অর্জন করা যায় না। ডক্টরদের বর্তমান কৃতিত্ব হল, অজপাড়াগ্রাম পর্যন্ত সুদ ব্যাপক করা। সুদ আগে শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। ডক্টর ইউনুস এসে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সুদের চক্করে পড়ে ভিটা-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

**দুই.** ডক্টর ইউনুসের আরেকটি কৃতিত্ব হল, সে গ্রামের পর্দানশীন দীনদার মা-বোনদেরকে ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে রাস্তায় নামিয়েছে।

মহিলাদের ইজ্জত-সম্মান পুরুষের তুলনায় বহুগুণ বেশী। নবীজী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতার চেয়ে মাতার হক তিন গুণ বেশী। (মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং ২০০২৮) আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সূরাতুর রিজাল 'পুরুষদের সূরা' নামে কোন সূরা নাযিল করেননি। অথচ সূরাতুন নিসা 'মহিলাদের সূরা' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন।

মহিলারা সৎ জীবন যাপন করলে এবং পর্দায় থাকলে তাদের গর্ভে আজও আব্দুল কাদের জিলানী, মুঈনুদ্দীন চিশতী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী রহ. প্রমুখের মত আল্লাহওয়ালা পয়দা হবে।

মা-বোনদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি কাজের জন্য বানিয়েছেন-

১. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগী করা।

২. স্বামীর সেবা-যত্ন এবং তার সংসারের হিফাযত করা।

৩. নিজেকে পর্দায় রাখা। যাদের সঙ্গে পর্দা করার হুকুম রয়েছে তাদেরকে নিজের সৌন্দর্য না দেখানো।

৪. নিজের সন্তানদেরকে প্রতিদিন কিছু কিছু করে কুরআন-সুন্নাহর তা'লীম দেয়া।

৫. মহিলা-মহলে দাওয়াতের কাজ করা।

এই কাজগুলো করার দ্বারা তার সামনে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে; সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৬৬১)

মহিলারা তাদের দায়িত্ব পালন করলে বাইরে গিয়ে চাকুরী করার সুযোগই পাবে না। অবশ্য সেলাই মেশিন দিয়ে, হাঁস-মুরগী লালন পালন করে, মেয়েদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে উপার্জনের অবকাশ রয়েছে।

**সন্তানকে গড়ে তুলুন**

সমাজের এই চলমান অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের করণীয় হল, নিজ নিজ সন্তানের হক আদায় করা। সন্তানের প্রধান হক হল, তাকে দীনের সহীহ তা'লীম দেয়া। আজীবন আল্লাহর রাস্তায় চলতে পারে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে, মৃত্যুর সময় পিতা-মাতার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পড়তে পারে, কালিমার তালকীন করতে পারে, জানাযা পড়াতে পারে, কবরে ডান কাতে শোয়াতে পারে– এই পরিমাণ দীনী ইলম শিক্ষা দেয়া। তাহলে মাতা-পিতা দুনিয়াতেও শান্তি পাবেন কবরেও শান্তি পাবেন। ঐ ছেলে যত আমল করবে সমস্ত নেকী পিতা-মাতার আমলনামায় যুক্ত হবে। হাশরের ময়দানে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সন্তান জান্নাতের যে স্তরে থাকবে পিতা-মাতাও ঐ স্তরে থাকবেন।

আর যদি পিতা-মাতা সন্তানকে দীনী ইলম শিক্ষা না দেয়, সন্তান বৃটিশ সিলেবাসে পড়ে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে বড় হয় তাহলে সে যত ধরনের গুনাহ করবে, সুদ খাবে, ঘুষ খাবে, মদপান করবে, মহিলাদের নৃত্য দেখবে, সমস্ত গুনাহ সন্তানের আমলনামায় তো থাকবেই; সমপরিমাণ গুনাহ পিতা-মাতার আমলনামায়ও যুক্ত হবে। ফলে হাশরের ময়দানে বহু পিতা-মাতাকে বিনা হিসাবে জাহান্নামে যেতে হবে। হাশরের ময়দানে সন্তান তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে যে, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা তাদের দুনিয়া সাজানোর জন্য আমাকে কুরআন সুন্নাহের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছিল; তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। পিতা মাতাকে আমার সামনে হাজির করুন তাদের বুকের উপর পা দিয়ে আমি দোযখে যাব। (সূরা হা-মীম সাজদা-২৯)

**হক্কানী উলামায়ে কিরামের আলামত ও তাঁদের দায়িত্ব**

ইলমের গুরুত্ব বুঝে নিজে আমল করা এবং সন্তানকে ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদেরকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক্কানী আলেমের আলামত বয়ান করে হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন,

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنماورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظوافر

অর্থ : উলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ দিনার-দিরহাম, টাকা-পয়সার ওয়ারিস বানান না; ইলমের ওয়ারিস বানান। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করল সে বিরাট অংশ হাসিল করল। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৬৪১)

এই হাদীসে হক্কানী আলেমদের দু'টি আলামত বয়ান করা হয়েছে-

**প্রথম আলামত :** উলামাগণ নবীগণের ওয়ারিস। লক্ষ্য করুন, এখানে ওয়ারিস বলা হয়েছে; নায়েব, খলীফা বা অন্য শব্দ বলা হয়নি। কারণ দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি থেকে মীরাস পেতে হলে তার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে-ভাই-বোন যে কোন ধরনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হয়। সম্পর্ক না থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে মীরাস পাওয়া যায় না। তদ্রূপ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পর্কের অটুট বন্ধন না থাকলে নবীজীর ওয়ারিস হওয়া যায় না।

বোঝা গেল, যে কোন ব্যক্তির বয়ান শ্রবণ করা যাবে না, তাফসীর শ্রবণ করা যাবে না, বই পড়া যাবে না। শোনার আগে নবীজী পর্যন্ত তার সম্পর্ক অর্থাৎ সনদ আছে কি না দেখতে হবে। আমরা যে কোন হাদীসই বয়ান করি সে হাদীসের সনদ আমাদের থেকে নিয়ে নবীজী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমাদের উস্তাদ হাদীস পড়ানোর সময় তাঁর থেকে শুরু করে কিতাব সংকলক পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করেছেন। কিতাব সংকলক থেকে নবীজী পর্যন্ত সনদ কিতাবের মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই যে কোন

হাদীসের সনদ আমরা আমাদের থেকে নিয়ে নবীজী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ।

হাদীসের সনদ ইসলামের সত্যতার একটি প্রমাণ। ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা একটি কথাও তাদের নবী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

**দ্বিতীয় আলামত :** মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির রেখে যাওয়া মিল-ফ্যাক্টরী, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি সমুদয় সম্পদের মধ্যে তার প্রত্যেক ওয়ারিসেরই অংশ থাকে। পরবর্তীতে নিজেরা আপোসে বন্টন করে নেয়। তদ্রূপ নবীজীর ওয়ারিসগণ হক্কানী উলামায়ে কেরাম নবীজীর রেখে যাওয়া সমস্ত কাজের ওয়ারিস। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওয়ারিসদের জন্য চারটি কাজ রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ : তিনি উম্মিদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। (সূরা জুমু'আ আয়াত ২)

এ আয়াতে হক্কানী উলামায়ে কেরামকে চারটি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে-

এক. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ উম্মতের সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াত শুনিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা।

দুই. وَيُزَكِّيهِمْ তাদের আত্মশুদ্ধি করা।

তিন. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ কুরআনের তিলাওয়াত সহীহ করা এবং হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয়া।

চার. وَالْحِكْمَةَ এবং হাতে কলমে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুন্নাতসমূহ শিক্ষা দেয়া।

কোন আলেম এই চারটি কাজ করলে সে-ই হক্কানী আলেম; নবীজীর সত্যিকার ওয়ারিস।

প্রত্যেক জিনিসেই আসল-নকল রয়েছে। আল্লাহওয়ালা এবং হক্কানী আলেম নিজ স্বার্থে দুনিয়াদারদের কাছে ঘোরাফেরা করে না। এ কারণে কওমী উলামাগণ সরকারের কাছে ঘেষে না, সরকারী সিলেবাস গ্রহণ করে না। যে সমস্ত আলেম দুনিয়াবী স্বার্থে সরকারী লোকদের সাথে, মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সাথে উঠাবসা করে, তাদের পক্ষে শ্লোগান দেয়– তারা দরবারী আলেম। এ সমস্ত আলেম কে দীনের ডাকাত বলা হয়েছে। উলামাগণ দীনের আমানতদার যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় লোকদের সাথে উঠা-বসা না করবে। অন্যথায় তারা দীনের ডাকাত। (কানযুল উম্মাল ১০/২০৪)

আমরা আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর গোলামী যে কোন আলেম থেকে শেখা যাবে না; তা হলে বেঈমান হওয়ার আশংকা রয়েছে।

একবার মওদূদী সাহেব এসেছিলেন আজিমপুরে। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতেন না। একআলেম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হুযূর! আপনি ফজরের নামায কখন পড়েন? বললেন, আমি রাত দু'টা তিনটা পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে কলম দ্বারা যুদ্ধ করি; এজন্য সময়মত নামায পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আমি সকাল ৮/৯ টার দিকে ফজরের নামায আদায় করে নেই। তো এ ধরণের লোকের মতাদর্শে বিশ্বাসী হলে ঈমান ধ্বংসের আশঙ্কা আছে।

কোন ধরনের আলেম থেকে গোলামী শিখতে হবে, তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিরের ২৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহওয়ালা উলামাদের দিলে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলার কোন হুকুম তারা ছাড়ে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজের কাছেও যায় না। আল্লাহর ভয়ে তারা কোন ধরনের নাজায়েয কাজের ধারে-কাছেও যায় না। এ ধরনের আলেমের বয়ান শোনার দ্বারা জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

বর্তমানে অনেক বক্তা আছেন, তারা নিজের বয়ান ভিডিও করার জন্য লোক ভাড়া করে নিয়ে আসে। অথচ প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

অর্থ : হাশরের ময়দানে সবচে' কঠিন আযাব দেয়া হবে ছবি অঙ্কনকারীকে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫০)

তবে শরীয়ত জরুরী প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। ছবি তোলা হারাম বটে; কিন্তু হজ্জ-উমরার জন্য ছবি উঠানো, পাসপোর্ট-ভিসার জন্য ছবি উঠানো, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদির কারণে অপারগতা বশত ছবি উঠানোর অবকাশ আছে। উদাহরণত মরা মুরগী খাওয়া হারাম; কিন্তু অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য হালাল খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকলে জান বাঁচানো পরিমাণ মরা মুরগী খাওয়ার অনুমতি আছে। তো হারাম তার নিজ স্থানে ঠিকই বহাল রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে।

বর্তমান যামানার মানুষের রুচিই বদলে গেছে। মাঠ গরমকারী বক্তা দাওয়াত দেয়। উচিত ছিল, ক্বলব ও অন্তর গরমকারী বক্তা দাওয়াত দেয়া। দীনের কথা শ্রবণের জন্য মাঠ গরমকারী বক্তা তালাশ করা যাবে না। যুক্তিবাদী চুক্তিবাদী খোঁজ করা যাবে না। যুক্তির নিরিখে বিশ্বাসের নাম শরীয়ত নয়। অন্ধভাবে বিশ্বাসের নাম শরীয়ত। কবরের আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সাইন্সের গণ্ডি যেখানে শেষ শরীয়তের সীমা সেখান থেকেই শুরু। মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল يؤمنون بالغيب গায়বের প্রতি বিশ্বাস করা। গায়ব হল এমন বিষয়াদি যা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, চামড়া দ্বারা অনুভব করা যায় না এমনকি বুদ্ধি খাটিয়েও উপলব্ধি করা যায় না; শুধুমাত্র ওহীর আলোকেই তা জানা যায়।

**যুক্তিযুক্ত হলে মানব, নইলে মানব না এমন মনোভাব নিয়ে শরীয়তের বিধানে যুক্তি খোঁজা নাস্তিকের কাজ**

নাস্তিকরা না দেখার কারণে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে না; অথচ তার মায়ের কথার কারণে বাপকে বাপ বলে বিশ্বাস করে। না দেখা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজন মহিলার কথা বিশ্বাস করে যদি কাউকে বাপ বলে ডাকা যায় তাহলে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সারা আরবের মুশরিকরা পর্যন্ত যার সত্যবাদী হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে, তিনি স্বচক্ষে মে'রাজের রাত্রে জান্নাত জাহান্নাম দেখে এসেছেন, আল্লাহ তা'লার দীদার লাভ করেছেন– তাঁর কথার ভিত্তিতে কি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করা যায় না?!

এসব নাস্তিক চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধম। চতুষ্পদ জন্তু তার মালিককে চেনে; কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের মালিককেও চেনে না। একটি কুকুরকে তিন দিন হাড্ডি দিন; আপনার দরজায় পড়ে থাকবে; পিটুনি দিলেও যাবে না। কুকুরের এতোটুকু বুঝ আছে যে, এই ব্যক্তি আমার মুনিব; তার পিটুনি দেয়ার

অধিকার আছে; তার দরজা ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু নাস্তিক নামক কুকুরগুলোর এতোটুকু বুঝও নেই যে, পাহাড়ের নিচ থেকে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যে আল্লাহ গ্যাস-তেল, স্বর্ণ ইত্যাদি খনিজ সম্পদ বের করে আমাদের প্রয়োজন মিটাচ্ছেন তিনিই আমাদের খালিক, আমাদের মালিক। এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে সূরা আ'রাফের ১৭৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অর্থ : এ সমস্ত লোক চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়, বরং এর চেয়েও অধম। এসব লোকেরাই উদাসীন।

কারণ চতুষ্পদ জন্তুও মালিক চিনে কিন্তু তারা মালিক চিনে না। হযরত আলী রাযি.-এর একটি উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, আয়াতের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা কুকুরকে বোঝানো হয়েছে। الدنيا جيفة، وطلابها كلاب দুনিয়ার দৃষ্টান্ত মৃত জন্তুর ন্যায় আর দুনিয়া-অন্বেষী ব্যক্তিরা কুকুরের ন্যায়। (কাশফুল খফা ১/৪০৯)

**উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব**

জনসাধারণের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব দুই প্রকারের। একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী।

**উলামায়ে কেরামের স্থায়ী দায়িত্ব হল,** জনসাধারণকে ছয়টি জিনিসের তা'লীম দেয়া। যথা–

এক. শিরকমুক্ত ঈমান শিক্ষা দেয়া।

দুই. ইবাদাত বন্দেগী তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কাফন-দাফনসহ সমস্ত আমলের সহীহ তরীকা শিক্ষা দেয়া।

তিন. হালাল পন্থায় আয় উপার্জনের তরীকা শিক্ষা দেয়া।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সপ্তাহ/ দশ দিনের মধ্যে ফারায়েয বের করে ওয়ারিসদের প্রত্যেকের অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। অথচ আমাদের সমাজে আট-দশ বছরেও ভাইয়েরা বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেয় না। এসব ক্ষেত্রে বোনদের হক নষ্ট করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় এতীমের মাল ভক্ষণ করা হয়। এগুলো সম্পূর্ণ হারাম।

চার. বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট বানানো। পিতা-মাতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, সন্তানাদি, ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীর হক, এমনকি জীবজন্তুর হক আদায়ের ব্যাপারেও যত্নশীল বানানো। অন্য সকল হক আল্লাহ তা'আলা চাইলে মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তা'আলাও মাফ করবেন না; বরং হাশরের ময়দানে নেকী দ্বারা হক আদায় করা হবে। নেকী না থাকলে অন্যের গুনাহ তাকে বহন করতে হবে। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৫১৭২)

পাঁচ. সাধারণ মানুষের আত্মশুদ্ধির ফিকির করা। শরীরের রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত; অন্তরের রোগের চিকিৎসা করা ফরযে আইন। অন্তরের চিকিৎসার পন্থা হল আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করা। সাহাবায়ে কেরামের হাজারো গুণাবলী ছিল; কোন গুণ দ্বারা তাদের নামকরণ করা হয়নি; শুধুমাত্র নবীজীর সোহবত অবলম্বনের গুণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে সাহাবী। হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, অহংকার, রিয়া, কৃপণতা, লোভ-লালসা, আত্মতুষ্টি, পরশ্রীকাতরতা– অন্তরের এ রোগগুলোর প্রত্যেকটিই ক্যান্সারের মত। অন্তরের রোগের কারণেই বাহ্যিক গুনাহ প্রকাশ পায়।

ছয়. দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সময় বের করা।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম; কেয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবী আসবেন না। কাজেই এই দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে উলামা এবং জনসাধারণ সকলের উপর দাওয়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ কারণেই কুরআন পাকে আমাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান -১১০)

**উলামায়ে কেরামের অস্থায়ী দায়িত্ব হল,** যে কোন ধরণের বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তা প্রতিরোধ করা।

উদাহরণত সাহাবা-বিদ্বেষী ও সাহাবাদের দোষচর্চাকারী দল, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, শিয়া মতবাদ, লা-মাযহাবী ফিতনাসহ সকল ফিতনা সম্পর্কে সজাগ থাকা।

সাহাবা-বিদ্বেষী ও সাহাবাদের দোষচর্চাকারী দলের ফিতনা ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেব তার এক কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে দিয়ে কয়েকটি কবীরা গুনাহ করিয়েছেন। আরেক কিতাবে লিখেছেন, রাসূলে খোদা ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি বলা যাবে না। অথচ আমি কুরআন থেকে প্রায় দশটি আয়াত পেশ করতে পারব যেখানে হাযারাতে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে সত্যের মাপকাঠি বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায় আমাদের নবীকে শেষ নবী মানে না। অথচ এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বহু সুস্পষ্ট বাণী বিদ্যমান। তারা দাবী করে, পাকিস্তানের কাদিয়ান শহরে না কি গোলাম আহমাদ নামে নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী অস্বীকার করায় এবং তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করায় তারা কাফের।

অনুরূপভাবে শিয়ারাও একটি অমুসলিম সম্প্রদায়। তারা আমাদের কুরআনকে হযরত উসমান রাযি. এর বানানো বলে দাবী করে। আসল কুরআনে না কি ১৭ হাজার আয়াত থাকতে হবে। অথচ বর্তমান কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২শত ৩৬।

আবার লা-মাযহাবী বা আহলুল হাদীস নামে বর্তমানে এক ফিরকা বের হয়েছে। তারা নিজেদের নাম দিয়েছে আহলুল হাদীস; কিন্তু হাদীসের কিছুই বোঝে না। এই ফিরকার গোমরাহী বোঝানোর জন্য আমি চারটি কিতাব লিখেছি– **হাদীসে রাসূল, তুহফাতুল হাদীস, মাযহাব ও তাকলীদ এবং হাদিয়ায়ে আহলুল হাদীস।**

অনুরূপভাবে ডাক্তার জাকির নায়েকের কারণেও বহু মুসলমানের ঘরে টেলিভিশন আমদানী হয়েছে। ডাক্তার হয়ে তিনি ফাতওয়া দিতে পারলে মুফতী সাহেবরাও তার টিউমার অপারেশন করতে পারবেন!!

যা হোক, আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আজকের আলোচনায় ইলমের গুরুত্ব, হক্কানী উলামায়ে কেরামের আলামত, উলামায়ে কেরামের স্থায়ী এবং অস্থায়ী দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক্কানী উলামায়ে কেরাম চিনে তাদের সাহচর্য লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাতুল্লাহ
শিক্ষার্থী, ইফতা ২য় বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

## আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদে' প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা এখন থেকে ইয়াদে-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করবে। অনুবাদ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত* **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।**

# ইয়াদে

## শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

আমি নিজেকে 'দেওবন্দের অনুসারী' বলতে, লিখতে শুধু এই জন্যই দ্বিতীয়বার ভাবি যে, এতে একরকম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ অনুভব হয়। দেওবন্দের অনুসারী কথাটি শুনলে কেউ কেউ ভুলধারণার শিকার হন যে, দেওবন্দী হয়তো কোন ধর্মীয় ফেরকা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত থেকে দূরে সরে ভিন্ন মতবাদের প্রবর্তন করেছেন। অথচ দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনার ধারকবাহক উলামায়ে কেরাম নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমলের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে কুরআন-সুন্নাহর সেই মধ্যপন্থা মর্মের প্রবক্তা, যেটি চৌদ্দ'শ বছর ধরে উম্মতে মুহাম্মাদী লালন করে আসছেন। তাঁরা নতুন কোন দল-মতের গোড়াপত্তন করেননি। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত যে আকীদায় বিশ্বাসী এবং যে আমলের উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উলামায়ে দেওবন্দ ঠিক একই আকীদা এবং আমলের উপর সুদৃঢ়। তবে কখনো সেই আকীদা-বিশ্বাস ধূলোমলিন হতে দেখলে, হেকমতের সাথে শক্তহাতে সেটা রুখে দেবার চেষ্টা তো অবশ্যই করেছেন। ফলশ্রুতিতে কতিপয় বিদ্বেষী এই অপবাদ আরোপ করলো যে, উলামায়ে দেওবন্দ একটি ভিন্নধর্মী ফেরকা। এই বিষয়ের উপর হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব রহ. রচিত 'উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনী রুখ অওর মাসলাকী মেযাজ' চমৎকার একটি কিতাব। কিতাবটির ভূমিকায় আমি এই বিষয়টির বিশদ বিবরণ দিয়েছি। এখন শুধু এতটুকুই বলতে চাচ্ছি– উলামায়ে দেওবন্দকে দীনী কাজে নিজের আদর্শ মনে করা সত্ত্বেও নিজেকে দেওবন্দের অনুসারী বলতে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়। কারণ এর থেকে একরকম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আসে। তবে জন্মসূত্রে আমি অবশ্যই দেওবন্দী। আল্লাহর মেহেরবানী, আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমার জন্ম সেই শহরে, যেখানে দারুল উলূম দেওবন্দ ইলম, ফযল, দৃঢ়তা এবং মহৎকর্মপন্থার এক নজিরবিহীন সুউচ্চ পাহাড় দাঁড় করিয়েছে, যার উপমা হালযামানায় পাওয়া দুষ্কর।

দেওবন্দে আমাদের পূর্বপুরুষরা 'মিয়াঁজি' নামে খ্যাত ছিলেন। তখনকার সময়ে মিয়াঁজি একটি উপাধি ছিল। এ ব্যাপারে হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেছেন, 'যদ্দূর জানি, শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মকতবে কুরআনের তা'লীমের পাশাপাশি উর্দূ, ফার্সী এবং জাগতিক শিক্ষারও ব্যাপক রেওয়াজ ছিলো। এ সকল মকতব শিক্ষা-দীক্ষায় হালযামানার মডেল স্কুলের চেয়েও অধিক মানসম্মত ছিলো। যারা সেখানে পড়াতেন তাঁদেরকে 'মিয়াঁজি' বলে ডাকা হতো। তাঁরা সবাই দীনী শিক্ষার পাশাপাশি আমলের ক্ষেত্রেও বেশ অগ্রগামী ছিলেন। যেমন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর শায়েখ, মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ রহ. এবং মিয়াঁজি মুন্নু শাহ রহ.। তিনি দেওবন্দের একজন সাহেবে কাশ্‌ফ ও সাহেবে কারামত বুযুর্গ ছিলেন।'

আব্বাজান রহ. আরো লিখেছেন, 'আমাদের বংশের কোন শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য নসবনামা (বংশলতিকা) আমার হস্তগত হয়নি। তবে শরীয়তে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্র মজুদ থাকার শর্তারোপও করা হয়নি। তাই বয়োবৃদ্ধদের মুখে শোনা কথাকেই যথেষ্ট মনে করছি। আমি আমার বংশের বয়োবৃদ্ধদের থেকে বরাবরই শুনে এসেছি যে, আমাদের বংশ পরম্পরা হযরত উসমান রাযি.-এর খান্দানের সাথে গিয়ে মিলেছে।'

আমার জন্ম ৫ শাওয়াল, ১৩৬২ হিজরী সনে। এমনটাই দেখেছি হযরত আব্বাজান রহ.-এর ডায়েরিতে। তখনকার সময়ে ইংরেজী সন, তারিখ লেখার পরিবর্তে হিজরী সন, তারিখ লেখার ব্যাপক রেওয়াজ ছিলো। তাই আব্বাজান শুধুমাত্র হিজরী সন, তারিখ লিখে রাখাটাই যথেষ্ট মনে করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে হিসেব করে জানতে পারলাম, সেটা ছিলো ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের তিন তারিখ। জন্মদিনের এমন একটি ঘটনাও আমি আমার আম্মাজান ও ভাই-বোনদের থেকে শুনেছি, আমার জন্মের দিনে যে বিছানায় আমাকে শোয়ানো হয়েছিলো, অকস্মাৎ ছাদ থেকে একটি সাপ সেখানে এসে পড়লো। তখন কোনভাবে যদি সাপটাকে বধ করা না হতো, সেদিনই হয়তো পৃথিবী আমার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যেতো!!

যাইহোক, আমি আমার জীবনের শুধুমাত্র চার বছর, সাত মাস (অক্টোবর ১৯৪৩ থেকে মে ১৯৪৮ পর্যন্ত) দেওবন্দ শহরে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার বাল্যকালের যে সময়টুকু দেওবন্দে কাটিয়েছি, আদতে তখন ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা ভিন্ন অন্য সব ব্যাপারে অনুভূতিশূন্য থাকে। পরবর্তীতে বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে দুরন্ত শৈশবকেও ভুলে বসে। কিন্তু আমার শৈশবের দেওবন্দে ঘটে যাওয়া এমন অনেক স্মৃতি আজও হৃদয়ের ক্যানভাসে ঝলমলে হয়ে আছে। যেন আজও দেখতে পাচ্ছি অতীতের সে দিনগুলো!

সেকালে দেওবন্দের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ছিলো না। ছিলো না বিজলীবাতি আর ফ্যানের ব্যবস্থাও। সে সময় নলকূপের অস্তিত্বও আমাদের চোখে পড়েনি। আর একালের মতো তেল-গ্যাসের চুলায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থাপনা ছিল শুধুই কল্পনা। বৈদ্যুতিক বাল্বের জায়গায় মোমবাতি অথবা কেরোসিন ল্যাম্পের প্রচলন ছিলো। আজকালের নলকূপের পরিবর্তে মটকা অথবা পিতলের পাত্রে পানি জমিয়ে রাখা হতো। এগুলোতে পানি ভরবার জন্য সাধারণত মজদুরের সাহায্য নেয়া হতো। তারা চামড়ার বড় বড় পাত্র কোমরে বহন করে ঘরে ঘরে পানি পৌঁছে দিতেন। তবে একটু উন্নত ও অভিজাত অঞ্চলে সবাই সম্মিলিতভাবে লোহার পাইপলাইনের ব্যবস্থা করে নিতেন। পাইপে লাগানো হ্যান্ডেল সজোরে দাবিয়ে বালতি বা পাত্র পানি-পূর্ণ করা হতো। পানির সুবিধা ছাড়াও হ্যান্ডেলের আরেকটি ফায়দা ছিলো– এটা দাবানোর দ্বারা শারীরিক কসরতও হয়ে যেতো। বয়সস্বল্পতার দরুন যেহেতু আমি এ ধরনের শারীরিক কসরতের

উপযুক্ত ছিলাম না, তাই অন্যদেরকে হ্যান্ডেলে ঝুলতে দেখেই পরম আনন্দ লাভ করতাম! পান করার জন্য ঘরের পানপাত্রে সংরক্ষিত পানি গুমোট গরমেও ঠাণ্ডা-শীতল হয়ে থাকতো। বৈদ্যুতিক পাখার স্থানে হাতপাখার প্রচলন ছিলো। আজও যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, অজান্তেই আমি স্মৃতির দর্পণে হারিয়ে যাই।

মে-জুনের গনগনে রোদ যখন ইট-পাথরের দেয়াল ভেদ করে ঘরের ভেতরেও 'আগুন' ঝরাতো, বাড়ির আঙিনায় লাল ইটের নির্মিত ফ্লোরে কেউ একজন তখন পানি ছিটিয়ে দিতো। সেই ঈষদুষ্ণ ভেজা বাতাস হাতপাখার সাহায্যে ঘরের দিকে ঠেলে দেয়া হলে ভেজা মেঝে থেকে উঠে আসা সোঁদা গন্ধে আশপাশ ভরে উঠতো। এতে প্রচণ্ড গরমে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলা যেতো। সেই মৌসুমে আমি আমার আম্মাজানের সঙ্গে বাড়ীর আঙিনায় পেতে রাখা খেজুরপাতার তৈরি চৌকিতে ঘুমাতাম। তখন আমার আর তারাভরা আকাশের মাঝে না গ্যাস-পেট্রোল বা ডিজেলের কোন আবরণ প্রতিবন্ধক হতো, না দূর আকাশের প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত আলোকচ্ছটার ফলে ক্ষুদ্রতম তারকারা চোখের আড়াল হতো। অবাক রাতের দীপ্তিময় তারকারাজির বুক চিরে বয়ে চলা আকাশগঙ্গা এবং তার থেকে ফুটে ওঠা শুভ্রতার দিকে আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। আমরা ছেলেপুলেরা ভাবতাম– এটা আকাশপথ; আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের যাতায়াতের জন্য বানিয়েছেন। সে আকাশপথে ফেরেশতাদের বিচরণের কল্পনা করে করেই কখন যেন স্বপ্ন-রাজ্যে হারিয়ে যেতাম!

মন চাচ্ছে আজ আমার দুরন্ত শৈশবের কিছু বিক্ষিপ্ত স্মৃতির অ্যালবাম খুলে বসি। কিন্তু এটার জন্য প্রয়োজন প্রথমে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেয়া। আব্বাজান হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। কারণ আমার পরিচয় তাঁকে দিয়ে; তাঁর পরিচয় আমাকে দিয়ে নয়।

(আলহামদুলিল্লাহ! আমার লেখা 'মেরে ওয়ালেদ মেরে শাইখ' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং মাসিক আলবালাগ-এর মুফতিয়ে আ'যম সংখ্যায়ও এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। সেখানে মুহতারাম বড় ভাই মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী দা.বা. আব্বাজানের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে সেটা কিতাব আকারেও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আমাদের বংশ এবং পূর্বপুরুষদের জীবনবৃত্তান্তও স্থান পেয়েছে।)

আমি যাই হই না কেন, সবই তাঁর (আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর) নিসবতের কারণে। যদি কোন ভালাই ও কল্যাণ আল্লাহর তরফ থেকে পেয়ে থাকি, তবে সেটাও তাঁরই ফয়েয ও বরকত। যদি কোন খারাবী আমার ভেতর থেকে থাকে, তবে সেটা তাঁর সান্নিধ্য থেকে ফায়দা হাসিল না করার কারণে। মোটকথা আমার সব কৃতিত্বই তাঁর। কবি বলেছেন,

اگر سیاہ دلم، داغ لالہ زار توام۔
و گر کشادہ جبینم، گل بہار توام۔

দিল যদি হয় মোর ঘোর কৃষ্ণবর্ণের;
তবে কলঙ্ক আমি তব পুষ্পোদ্যানের।
নিয়তি যদি হয় মোর প্রসন্ন, দীপ্তিময়;
তবে কীর্তিসব তব পুষ্পিত বসন্তের।

সুতরাং আমার এ স্মৃতিচারণে ঘুরেফিরে বারবার আব্বাজানের আলোচনা আসতেই থাকবে।

আমি জন্মের পর থেকে আব্বাজানকে দু'টি কাজে ব্যস্ত সময় কাটাতে দেখেছি। সে সময়ে তিনি যদিও দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আ'যম পদবি এবং শিক্ষকতা থেকে অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। তথাপি অনেক তালিবুল ইলম তাঁর ছাত্রত্ব লাভের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তারা আমাদের ঘরে এসে পড়ে যেতেন। বর্তমানে এটাকে কোচিং বা টিউশন বলে। তবে উভয়টির মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আজকাল কোচিং ও টিউশনিকে উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম মনে করা হয়। অথচ দীনী মাদরাসাসমূহে উস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক এতটাই নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে, যদি কোন ছাত্রের জন্য দরস বা ক্লাসের পাঠ যথেষ্ট না হয়, তবে শিক্ষক তাকে ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময়ে পড়ানোকে শুধু দায়সারা নয়; বরং পূর্ণ দায়িত্ববোধের সাথে ছাত্রের হক মনে করে পড়িয়ে দেন। বিনিময়ে ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাকে মাদরাসার পরিবেশে অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হয়, তা শিক্ষক আর্থিকভাবে যতই দুর্বল হোন না কেন। আব্বাজান রহ. এই আবেগ নিয়েই ছাত্রদেরকে আমাদের ঘরে অথবা মসজিদে পড়াতেন।

আমাদের মহল্লার মসজিদের নাম ছিলো 'আ-দীনী মসজিদ' (ফার্সিভাষায় এটার অর্থ হচ্ছে– জুমু'আর মসজিদ)। তবে ব্যাপকভাবে লোকেরা এটাকে দীনী মসজিদ বলতেন। প্রথমে আমাদের দাদাজান মাওলানা ইয়াসীন রহ. এবং পরবর্তীকালে আব্বাজান রহ. এই মসজিদের মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব পালন করেন। কখনো কখনো আব্বাজান রহ. এই মসজিদেই দরস দিতেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যখন ঘরে অবস্থান করতেন, অধিকাংশ সময়ই তাঁকে কিছু না কিছু লিখতে দেখতাম। গ্রীষ্মের রাতে আমাদের ঘরের বারান্দায় কেরোসিনের ল্যাম্প ঝুলিয়ে দেয়া হতো। অধিকাংশ রাতে আব্বাজান সেই ল্যাম্পের নিভুনিভু আলোয় বসে, বাঁশের কলম (সেকালে এটাকে ক্লিক কলম বলা হতো) দোয়াত কালিতে ডুবিয়ে কী যেন লিখতেন। তখনো ফাউন্টেন পেনের প্রচলন হয়নি। এছাড়াও তিনি বৈঠকখানার সাথে একটি ছোট্ট কামরা বানিয়েছিলেন। আমরা ওটাকে 'হুজরা' বলতাম। এটা মূলত তাঁর ইবাদতখানা ছিলো। অহর্নিশ সেখান থেকে তিলাওয়াত, যিকির-আযকারের সুমধুর গুঞ্জরণ উঠতো।

আমার দাদাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার একবছর পূর্বে ১২৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রায় সমবয়স্ক। দাদাজানের এই উক্তি আমি আব্বাজানের কাছে বহুবার শুনেছি, তিনি বলতেন, 'আমি দারুল উলূম দেওবন্দের সেই স্বর্ণযুগ দেখেছি, যখন দেওবন্দের শাইখুল হাদীস থেকে নিয়ে চৌকিদার পর্যন্ত সবাই সাহেবে নিসবত আল্লাহর ওলী ছিলেন।'

আমাদের দাদাজান ছিলেন হযরত রশীদ আহমাদ গংগুহী রহ. এর খাস মুরীদ এবং হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. এর সহপাঠী। পুরো জীবন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ফার্সি ভাষা এবং গণিতের শিক্ষক ছিলেন। কয়েক যুগ ধরে ছাত্ররা তাঁর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আব্বাজান রহ. 'মেরে ওয়ালেদে মাজেদ' নামক কিতাবে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

শৈশবকালে আব্বাজানের ইলমী, আমলী উৎকর্ষের মূল্যায়ন-ক্ষমতা আমার কতটুকুই বা ছিলো! বস্তুত সেটা আজও নেই। তবে এতটুকু তো অবশ্যই ছিলো যে, আমার ছোট্ট এ ভুবনে তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র অগাধ আস্থা, বিশ্বাস এবং ভালোবাসার আকর। তিনিও আমাকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। আমার বড় ভাইদের সবাইকে কমবেশ

আব্বাজানের ভালোবাসার সাথে শাসনও সইতে হয়েছে। কখনো বা হালকা প্রহারের স্বাদও চাখতে হয়েছে। কিন্তু আমি অহর্নিশ শুধু তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি। আমার বয়স যখন বারো বছর ছুঁইছুঁই, তখন একবার আমি আমার আম্মাজানের সাথে লাহোরে বড় ভাইজানের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আব্বাজান ভাইজান বরাবর চিঠি লিখলেন, 'মুহাম্মাদ তাকী (সাল্লামাহু) কে ছাড়া আমার দিনকাল সহজে যাচ্ছে না।'

দেওবন্দ থাকাকালে আব্বাজানের শুধু মাদ্রাজের একটি সফরের কথা আমার মনে আছে। তখন তাঁর বিচ্ছেদ, শূন্যতা আমার জন্য যারপরনাই বিরহের ছিলো। সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি বায়না ধরে ভাইয়াদেরকে রাজি করিয়ে ফেললাম যে, আমিও রেলস্টেশন যাবো আব্বাজানকে রিসিভ করার জন্য। সবচে বড় আগ্রহের ব্যাপার তো এটাই ছিলো যে, আব্বাজানকে ইস্তিকবাল করবো। এছাড়াও রেলস্টেশনে যাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি আনন্দের ব্যাপার ছিলো। একটি হচ্ছে, স্টেশনে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়া ছিলো আবশ্যক। পুরো মহল্লায় শুধুমাত্র একজন হিন্দু লোকের কাছে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা ছিলো। সবাই তাকে ফাগু বলে ডাকতো। তার সেবা পেতে হলে আগেভাগেই তাকে বুকিং দিয়ে রাখতে হতো। আমরা তাই করেছিলাম। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ার উপলক্ষ আমাদের খুব একটা হতো না। কারণ কাছেধারে হলে তো পায়ে হেঁটেই চলে যেতাম। কিছুটা দূরের পথ হলে আম্মাজানের সাথে পালকিতে চড়ে যেতাম। সুতরাং স্টেশনে যাওয়ার জন্য এই রাজকীয় বাহনে চড়ার মজাই ছিলো আলাদা! যার কল্পনাটাও আমার কাছে বড় আনন্দের ব্যাপার ছিলো।

দ্বিতীয়ত রেলস্টেশনটা আমাদের জন্য পর্যটনকেন্দ্রের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। সেখানে গিয়ে আমাদের আনন্দ স্ফূর্তির সুযোগ খুব অল্পই হতো। তবু বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রেলস্টেশন ছিলো আমাদের জন্য পরম সুখের একটি জায়গা।

কিন্তু ঠিক যাওয়ার মুহূর্তে কিভাবে যেন আমার হাত পুড়ে গিয়েছিলো। তাই চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে ঘরেই থাকতে হলো। অবশেষে স্টেশনে যাওয়া থেকে মাহরূম রয়ে গেলাম। এই মাহরূমী আমার জন্য বেশ ক'টি মাহরূমের সমষ্টি ছিলো। তাই না যেতে পারার আক্ষেপ আজও আমার মনে আছে! তবে এরপরের আনন্দঘন মুহূর্তটাও আমি ভুলতে চেয়ে ভুলতে পারি না! যেই না আব্বাজান ঘরে প্রবেশ করলেন, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সবার আগে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। কেরোসিন ল্যাম্পের টিমটিমে আলোয় তাঁর মুখভর্তি ঘন কালো শ্মশ্রু এবং সহাস্যবদনের কথা আজও আমার কল্পনাবিলাসী মনে গেঁথে আছে, যেন এখনও তা দেখতে পাচ্ছি এবং হাত বাড়ালেই পারি ছুঁয়ে দিতে!

চলবে ইনশাআল্লাহ...

(২৫ পৃষ্ঠার পর; রক্তভেজা ফিলিস্তিন)

তাদের একদল– যারা আদি চেতনায় বিশ্বাসী– তারা বলছে, সলোমন মন্দিরের নির্মাণ তাদের প্রতিশ্রুত মাসীহই করবেন। তার আগমনের আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

এদিকে অপর দল, যারা নব চেতনায় বিশ্বাসী এবং বর্তমানে ইসরাইলের ক্ষমতার বাগডোর যাদের হাতে, তারা বলছে, বাইতুল মাকদিস ও পশ্চিম দেয়ালের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যাশিত মাসীহী যুগে পদার্পণ করেছি। ইসরাইলী সেনাবাহিনীর প্রধান চীফ রাব্বি বাইতুল মাকদিসের নিয়ন্ত্রণ অর্জনের পর পশ্চিম দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেন, 'আজ এই নিয়ন্ত্রণ অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রত্যাশিত মীসীহী যুগে পদার্পণ করলাম।' উপরোক্ত দুই কারণে ইহুদী জাতি তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এখনো বিলম্ব করছে। তাই কখনো মসজিদে আকসায় অগ্নিসংযোগ করে কখনো বা জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা দিয়ে তারা মুসলিম বিশ্বের সচেতনতা ও সহমর্মিতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে।

তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য তথা মৌরুসী আবাসভূমি হিসেবে গোটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে অধিকার করা। এ ব্যাপারে তাদের টার্গেট অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ইসরাইলী পার্লামেন্টের সম্মুখ দেয়ালে লেখা আছে, 'হে ইসরাইল! তোমার সীমানা নীলনদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত'। পৃথিবীতে একমাত্র ইসরাইলই এমন রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র অন্যান্য দেশের ভূখণ্ডকে অন্যায়ভাবে দখলের এমন খুল্লমখোল্লা ঘোষণা দিতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। Zionist আন্দোলনের পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, সে হিসেবে ইসরাইলের আগামী টার্গেটে নীলনদ পর্যন্ত মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাকের একটি অংশ, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং (আল্লাহর পানাহ) মদীনা মুনাওওয়ারাসহ হিজাযের গোটা উচ্চাঞ্চল রয়েছে। যদি আরব বিশ্ব এখনো গাফিলতের ঘুমে বিভোর থাকে এবং ভবিষ্যতেও তাদের দুর্বলতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে, যেমনটি আজ করছে, তাহলে হয়তো ইহুদীদের এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে বেশি সময় লাগবে না।

সুতরাং আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, এ সঙ্কট মুসলিম জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট। এ সঙ্কটের নিরসন শুধুমাত্র মসজিদে আকসার হিফাযতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা মসজিদে আকসার হিফাযত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত জেরুসালেম ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর জেরুসালেমের হিফাযত সম্ভব নয়, যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ইহুদী-অধিকারে থাকবে।

সুতরাং এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের একটিমাত্র পথ আছে। তা হলো, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে ইহুদীদের অন্যায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত করা। আজ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে লাগাতার অবৈধ বসতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের বিরোধিতায় এমন চরম ও বিপজ্জনক প্রান্তে ইসরাইল নিজেকে স্থাপিত করেছে, সে অবস্থান থেকে ফিরে আসার কাজ কিভাবে ইসরাইল সম্ভব করতে পারবে, ভেবে ওঠা যায় না। অথচ তাকে এ কাজ করতেই হবে। আর এর সহজ পন্থা হলো, বেলফোর ঘোষণার পূর্বে ফিলিস্তিনের যতটুকু অংশে ইহুদীদের বসবাস ছিল, শুধুমাত্র সেখানেই তাদের অধিকার থাকবে এবং অধিকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চলকে তার প্রকৃত হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু শক্তি মদমত্ত এক হিংস্র জন্তুর কাছে এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবতা হল, লোহা কাটতে হলে লোহার বিকল্প নেই। সুতরাং যা করার মুসলিম উম্মাহকেই করতে হবে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের আর কোনো পথ নেই।

লেখক : শিক্ষার্থী, দারুল উলূম দেওবন্দ
উত্তর প্রদেশ, ভারত।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরিদাবাদ মাদরাসায় আসাতিযায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত

# হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বয়ান

**বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল কাসিম**

### পটভূমি

*[আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার সুবাদে দীন শিক্ষা করা এবং দীনের উপর চলার সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকের উপর দাওয়াত ও তাবলীগের যিম্মাদারীও অর্পিত হয়েছে। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে খেতাব করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুযোগ্য অনুসারী হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর যামানার পরে দীর্ঘদিন যাবৎ এ মেহনত ইজতিমায়ীভাবে ছিল না বললেই চলে। আল্লাহ তা'আলা আপন সীমাহীন করুণায় এ মেহনত পুনরায় ইজতিমায়ীভাবে চালু করলেন হিন্দুস্তানের বস্তি-নিযামুদ্দীনের বাংলাওয়ালী মসজিদ হতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ.-এর মাধ্যমে ১৯২৬ সালে।*

*হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ-. এর হাতে গড়া অন্যতম সুযোগ্য শাগরেদ ছিলেন হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.। তাঁকে সৌদি আরবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত চালু করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। তিনি চল্লিশ বছরের অধিককাল মদীনা মুনাওয়ারায় তাবলীগের আমীর হিসেবে অবস্থান করে বর্ণনাতীত কুরবানীর সাথে এ মেহনতের খেদমত আঞ্জাম দেন। ফলশ্রুতিতে তায়েফসহ পুরো সৌদী আরবে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ব্যাপকতা লাভ করে। হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. ছিলেন পুরোপুরি সুন্নাতের অনুসারী একজন সত্যিকার আশেকে রাসূল। তাঁর সম্পর্কে আমার মুহতারাম শাইখ সারা বিশ্বের তাবলীগের আমীর তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ. বলতেন, 'হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের প্রতিটি হরকত ও নড়াচড়া থেকে সুন্নাত টপকে টপকে পড়ে।' এই আশেকে রাসূল ও তাঁর মুহতারামা আহলিয়ার কবর রচিত হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাস কুদরত দ্বারা মদীনাওয়ালার রওযায়ে আতহারের পাশে প্রায় দশ হাজার সাহাবী রাযি. এর সাথে জান্নাতুল বাক্বীতে। (—যেখানে ঠিকানা বানাবার জন্য আমি আবুল কাসিম সমস্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহর সীমাহীন রহমতের পানে তাকিয়ে একজন প্রার্থী। আমিসহ সকল প্রার্থীকে আল্লাহ তা'আলা আপন মেহেরবানীতে মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদাত ও ঈমানী মওত নসীব করুন। আমীন।)*

*১৯৮৮ হতে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা নয় বছর হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. বাংলাদেশের টঙ্গীতে পুরানাদের জোড় উপলক্ষে তাশরীফ এনে আমাদের দেশ ও জাতিকে ধন্য করেন। তাঁর এ নয় বছর বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে কাকরাইলের মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুকীত সাহেবের নির্দেশে আমি ছিলাম তাঁর সফরসঙ্গী ও বয়ানলেখক।*

*তিনি জোড়ে বয়ান করতেন, সফরে বয়ান করতেন, বিভিন্ন মাদরাসায় যিয়ারতে গিয়ে মুহতামিম সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতেন, উস্তাদ ও তালিবে ইলমদের মধ্যে বয়ান করতেন। খানাপিনা, বিশ্রাম, নামায, তিলাওয়াত, মামুলাত ইত্যদি জরুরতের সময় বাদ দিয়ে সারাক্ষণ ছোট/বড় মজমায় দাওয়াত ও দীনী বিষয়ে জরুরী কথা বলতেই থাকতেন। আমার দায়িত্ব ছিল, আমাকে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত নিজস্ব শর্টহ্যান্ড কায়দায় তার সব কথা লিখে ফেলা। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর প্রায় সব কথাই কলমবন্দ করার তৌফিক আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। ইখলাসের সাথে, আমানতদারীর সাথে, অবিকৃতভাবে, পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি ও শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাগুলো পৌঁছাবার তৌফিক দান করে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে মুনাসিব তারতীবে আলমী ফিকিরের সাথে যিম্মাদারী আদায়ের তাওফীক দান করেন। আমীন।*

*'১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরিদাবাদ মাদরাসায় আসাতিযায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বয়ান' শিরোনামে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের বাংলাদেশে অবস্থানকালীন দিনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি দিনের কর্ম ও কথামালা হতে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করলে এখন কিছু পেশ করার চেষ্টা করব।]*

###

বৃহস্পতিবার, ২৪ শে আগস্ট, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ। আমার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি দিন। সারাদেশের তাবলীগের মারকাজ কাকরাইল মসজিদে এই দিনেই সর্বপ্রথম ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। একই দিনে ঢাকা মহানগরীর অন্যতম প্রাচীন দীনী প্রতিষ্ঠান ফরিদাবাদ মাদরাসায় মদীনা মুনাওয়ারার তাবলীগের আমীর, হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বয়ান পেশ করেন। আমি ছিলাম প্রথম ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী; দ্বিতীয়টির লেখক।

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব ছিলেন আমাদের দৃষ্টিতে এ সময়ে বিশ্বের সবচে' বড় তাবলীগের মুরুব্বী; কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিতেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তালিবে ইলম হিসেবে। তাঁর পাসপোর্টে লেখা ছিল— বয়স : ৯০, পেশা : Student (ছাত্র)।

তিনি উলামায়ে কেরামের মহব্বতে তাঁদের যিয়ারতে বিভিন্ন মাদরাসায় তাশরীফ নিতেন। দু'দিন আগে ২২/০৮/১৯৮৯ তারিখে দু'টি মাদরাসা যিয়ারতে যান; হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী সাহেবের বারিধারা মাদরাসায় এবং খিলগাঁও চৌরাস্তা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাখজানুল উলুম মাদরাসায়। আজ তাশরীফ নিলেন ফরিদাবাদ মাদরাসায়।

সকালে নাস্তার পর তিনি কাকরাইল মসজিদের দোতলার উত্তর পার্শ্বের (বর্তমান লিফটের পশ্চিম পার্শ্বে) কামরা হতে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে না নেমে দক্ষিণদিক দিয়ে মূল মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে ছিলেন কাকরাইলের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকীত

সাহেব রহ., মাওলানা আলী আকবর সাহেব রহ., মাওলানা রবিউল হক সাহেব দা.বা., মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব দা.বা. এবং অন্যান্যদের সঙ্গে হাজী আব্দুল মুকীত সাহেবের নির্দেশে আমি। মসজিদে প্রবেশ করেই সাঈদ খান সাহেব উপরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, পুরো মসজিদ জুড়ে একটা ফ্যানও নেই। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন : মসজিদে ফ্যান নেই?

–না।

–কেন?

–মুজাহাদার মধ্যে হিদায়াত রয়েছে। তাই উম্মতকে মুজাহাদায় অভ্যস্ত করানো হচ্ছে।

–(মসজিদের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত মুরুব্বীদের কামরার প্রতি ইঙ্গিত করে) আপনাদের কামরায় ফ্যান নেই?

–আছে।

আর যায় কোথায়! গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, ফরিদাবাদ মাদরাসায় যিয়ারত ও বয়ান থেকে ফিরে আজই আমি দু'টো জিনিসের একটি দেখতে চাই–

এক. হয় দেখব পুরো মসজিদ জুড়ে ফ্যান লেগে গেছে, অথবা

দুই. আপনাদের (মুরুব্বীদের) কামরা হতে সব ফ্যান খোলা হয়েছে।

এরপর একটা তীর্যক প্রশ্ন করলেন– 'মুজাহাদা শুধু পাবলিকের জন্য?!'

যাহোক, মাইক্রোযোগে আমরা ফরিদাবাদ মাদরাসায় পৌঁছলাম।

মুহতামিম সাহেবের কামরায় মেহমানদারীর পর মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়–

সাঈদ খান সাহেব : মাদরাসাটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

মুহতামিম সাহেব : ১৩৭৫ হি./১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সাহেব রহ.-এর মাধ্যমে।

–তলাবাসংখ্যা কত?

–পাঁচশত।

–দাওরা ফারেগ হতে কত বছর লাগে?

–১৪ বছর (ইবতিদায়ী থেকে আখের)।

–এ বছর (১৯৮৯) দাওরায়ে হাদীসে তলাবা কত জন?

–চল্লিশ জন।

–মিশকাত জামা'আতে কত জন?

–১২ জন।

–শরহে জামীতে কত জন?

–২৫ জন।

–মাশাআল্লাহ! তলাবা বাইরের কেউ আছে?

–না, সব বাংলাদেশী।

–বার্মারও নেই?

–না।

ইমদাদী খানা দেয়া হয় কতজন তলাবাকে?

–দুইশত।

–আমিও একজন তালিবে ইলম। যত জামা'আত আল্লাহর রাস্তায় বের হয় দীনের তলবেই বের হয়।

\# # #

এরপর মুহতামিম সাহেবের কামরাতেই মাদরাসার উস্তাদদের একত্র করা হলে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব উর্দুতে তরজমাবিহীন ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (১০: ৫৩ থেকে ১২: ০৭ পর্যন্ত) বয়ান করলেন। অত্যন্ত মূল্যবান সে বয়ানের অংশবিশেষ উপস্থাপন করছি।

খুতবায়ে মাসনূনা, আয়াতে কারীমা ও হাদীসে পাক হতে তিলাওয়াত করে তিনি বলেন, আমি শুধু মুযাকারা করছি, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আলেম নই; আমি তালিবে ইলম। আমি এখানে সেখানে সবখানে মুযাকারা করি, যেন ঐ যিন্দেগী আমাদের মধ্যে চলে আসে, যে যিন্দেগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মধ্যে তৈরি করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আর সেই যিন্দেগী দাওয়াত দ্বারাই আসবে।

কুরআনে পাকের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত–

اقرا باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم. الذى علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم.

(অর্থ :) পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা 'আলাক- ১-৫)

এ আয়াতগুলোতে আছে শুধু আল্লাহর সঙ্গে বান্দার পরিচিতি। হুকুম-আহকাম হিসেবে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতগুলো এই–

يا ايها المدثر. قم فانذر. وربك فكبر.

(অর্থ :) হে বস্ত্রাবৃত! ওঠো, সতর্ক করো এবং নিজ প্রতিপালকের বড়ত্বের কথা বলো। (সূরা মুদ্দাসসির- ১-৩)

দেখুন, দাওয়াতের আহকাম সংবলিত আয়াত প্রথমে এসেছে। দাওয়াতওয়ালা 'আমর' প্রথমে এসেছে। দাওয়াত দ্বারা আল্লাহর সমস্ত হুকুমের উপর চলার যোগ্যতা আসে। দাওয়াত দ্বারা ইস্তেদাদ পয়দা হয়। অতঃপর ইস্তেদাদ বা যোগ্যতা মোতাবেক আল্লাহর হুকুমসমূহ নাযিল হয়। যত ইস্তেদাদ তত হুকুম। দাওয়াত দ্বারা আল্লাহর হুকুমের উপর চলার গুরুত্ব পয়দা হয়। দাওয়াত দ্বারাই আল্লাহর হুকুম বিস্তার লাভ করে। দাওয়াত দ্বারাই নামায পড়নেওয়ালার খুশু হাসিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

(অর্থ :) নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবূত-৪৫)

নামায দ্বারা ঈমান ও ইহতিসাব হাসিল হয়। নামায দ্বারা আল্লাহ মুশকিল দূর করেন। মুশকিল ও অসুবিধা দূর করতে দেয়া হয়েছে নামাযের বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واستعينوا بالصبر والصلوة..

(অর্থ :) সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর। (সূরা বাকারা- ৪৫)

অর্থাৎ আগে জমতে হবে। মজবুত হতে হবে। হালাত আসলে ঘাবড়াব না। দীনের ওপর জমে যাবো। তারপর হালাত আর অসুবিধা দূর করার তরীকা হল নামায।

যে দাওয়াত দিতে দিতে অন্যদের নামায পড়ায়, তার সব অসুবিধা দূর হয়। বাতাস জোরে প্রবাহিত হলে, সূর্য গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নামাযে মনোনিবেশ করতেন।

এভাবে সমস্ত হুকুম-আহকাম দাওয়াত দিতে দিতে আসে। দাওয়াতের যরিয়ায় ঐ আহকামাতের প্রতি আকীদাত পয়দা হয়। ভক্তি-মহব্বত সৃষ্টি হয়। তখন আমল করা সহজ হয়। যখন আমল করা হয় তখন তা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। সাহাবায়ে কেরামের 'সও ফী সদ' (সবাই) দাওয়াত দিতেন।

আরেকটি জিনিস হল, দাওয়াত দিলের মধ্যে জোড় পয়দা করে। রোজা তাকওয়া পয়দা করে। নামায নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত রাখে। যাকাত গরীবদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে। হজ্জ ইত্তিফাক ও ইত্তিহাদ পয়দা করে। দাওয়াতের লাখো ফায়দা আছে। দাওয়াতের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও দেশের মুসলমানগণ "انما المومنون اخوة" এর ভিত্তিতে ভাই ভাই হয়ে যাবে। দাওয়াতের দ্বারা তাদের থেকে স্বজনপ্রীতি খতম হবে এবং সবার মধ্যে হামদর্দী আসবে। এভাবে তাদের দিলগুলো পরস্পরে জুড়তে থাকবে।

কোন হুকুম আসলে সাহাবাদের রাযি. কেউ বলতেন না যে, এ হুকুম মানা

কঠিন। তাঁদের কাছে সব হুকুম মানা ছিল আসান (সহজ)। তাঁরা দাওয়াত দ্বারা দু'আর মাকামে পৌঁছেছেন। দাওয়াত ও দু'আর মাদ্দা (মৌল-অক্ষর) একই।

দাওয়াত হচ্ছে মাখলুককে আল্লাহর দিকে ডাকা। আর দু'আ হচ্ছে আল্লাহকে মাখলুকের দিকে ডাকা। দাওয়াত মাখলুককে বলে, আল্লাহর আহকামাত ও আমরের সামনে নত হও। আর দু'আ রাতের বেলা আল্লাহকে বলে, আয় আল্লাহ! এর উপর রহম কর, আজাব হটাও, রহমতের দরজা খোলো, কবুল করে নাও।

দাওয়াত দিতে দিতে সকল সাহাবা মাকামে দু'আয় পৌঁছে যান। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. সামনে নদী পড়ায় বাধা প্রাপ্ত হন। রাতে স্বপ্নে দেখেন। সকালে বয়ান করেন। নদীর উপর দিয়ে ঘোড়া দৌড়ে দশ হাজারের লশকর নিয়ে পার হয়ে যান।

দু'আয় শক্তি আসে দাওয়াত দ্বারা।

আল্লাহর হুকুম মানা হয়–

এক. বিতৃষ্ণার সাথে।

দুই. শওক ও আগ্রহের সাথে। শওকের সাথে আল্লাহর হুকুম মানলে দরজা খোলা হয়। এজন্য দাওয়াতের বিধান আগে আসে। ফলে দীনের উপর চলাও সহজ হয়। আর দীনের বিস্তার লাভও সহজ হয়। দাওয়াত ছুটে যাওয়ার দ্বারা মানুষ ঈমান-আমল থেকে বের হয়ে যায়।

হযরত নূহ আ. দু'আ করেছিলেন,

رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.

(অর্থ :) হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না। (সূরা নূহ-২৬)

সমস্ত কাফিরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন। একজনও নাফরমান অবশিষ্ট থাকল না। নূহ আ.-এর ইন্তেকালের পর দাওয়াত থাকল না। দাওয়াত না থাকায় আবার বাতিল ছেয়ে গেল। কুরআন বলছে, দাওয়াত চললে হক গালিব হবে, বাতিল মাগলুব হবে; অন্যথায় বাতিল ছেয়ে যাবে। প্রত্যেক নবী চলে যাওয়ার পর দাওয়াত ছুটে যায়। আর দাওয়াত ছুটলে বাতিল ছেয়ে যায়। কুরআন বলছে,

قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني.

(অর্থ :) হে নবী! বলে দিন, এই আমার পথ; আমিও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। (সূরা ইউসুফ-১০৮)

লক্ষণীয় হল, এখানে 'ومن اتبعني' বলেছেন, 'من العلماء' বলেননি। 'من اتبعني' আম-ব্যাপক।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সবাই আলেম ছিলেন না। কিন্তু পুরুষ-মহিলা সবাই দাওয়াত দিতেন। তাই বাতিল মিটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হক গালিব হয়; উপরে উঠে আসে। আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পর দাওয়াত ছুটে যাওয়ায় বাতিল উপরে উঠে আসে।

দাওয়াত দ্বারা বাতিল টুটে। শয়তান তো বিশ্রাম নেয় না; শয়তান বাতিলের দাওয়াতে লেগেই আছে। শয়তানের মুকাবিলা করবে হকের দাওয়াত। সব আমল শয়তানের মুকাবিলা করতে পারবে না। শয়তানের বাতিল দাওয়াতের মুকাবিলা হকের দাওয়াত দ্বারা করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ দ্বারা বাতিল ভয় পায় না, আতঙ্কিত হয় না। গির্জায় নামায পড়তে চাইলে জায়গা দিবে। রোযা রাখতে দিবে। গরীবদেরকে যাকাত দিতে দিবে। হজ্জ করতে বাধা দিবে না।

পক্ষান্তরে যদি বলা হয়, আসো, তোমাকে দাওয়াত দেবো; অমনিই চেহারা পাল্টে যাবে। বুনিয়াদী গলত হলো, আমরা যে কোন আমল দ্বারা বাতিলের দাওয়াতের মুকাবিলা করতে চাই।

আরেকটি কথা হল, যে লাইনে মেহনত হবে, সে লাইনে দু'আ কবুল হবে।

رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! এই কাফিরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না। (সূরা নূহ-২৬)

এ ছিল দু'আর অ্যাটম বোম। নূহ আ. দীর্ঘ মেহনতের পর এ দু'আ করেন। তার দু'আর ফলে একজন নাফরমানও জমিনের বুকে অবশিষ্ট থাকল না। আজ আমার দু'আ বে-জান। আমার দু'আ প্রাণহীন। ইসলামের জন্য মেহনত করে দু'আ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'আ বদরে চেয়েছেন, তা মসজিদে নববীতে চাননি। তিনি খন্দকে দু'আ করেছেন, ফলে ঝড়ো-হাওয়া আসে। বাতিলের সমস্ত প্ল্যান লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এ দু'আ কিন্তু মসজিদে চাননি? আজ ময়দানের দু'আ আমরা মসজিদে চাচ্ছি। আর জান-মালের কুরবানী না করেই দু'আ চাচ্ছি। ছাত্র কলেজে, দপ্তরী দপ্তরে, আর আমরা বিনা মেহনতে দু'আ চাচ্ছি। তাই আগে উম্মতকে দাওয়াতের ওপর দাঁড় করতে হবে।

খওফের হালতে যিকির করা আর আমানের হালাতে যিকির করায় বেশকম আছে। যেমন চতুর্থ কালেমা বাজারে পড়লে দশ লাখ নেকি কিন্তু মসজিদে পড়লে দশ নেকি। কারণ, বাজারে যিকিরের মা-হওল (পরিবেশ) নেই।

এখন সব কাজ 'من حيث العلم' হচ্ছে, 'من حيث الهداية' হচ্ছে না।

হিদায়াত আসলে ঈমান বাড়বে, আমলে সিফাত আসবে, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের সিফাত আসবে। সিফাত আল্লাহর মাহবুব (প্রিয়)। সিফাত বান্দারও মাহবুব; এমনকি কাফেরেরও মাহবুব। যদি কেউ চাকরীর জন্য কোথাও যায়–ইহুদী, খ্রিস্টান, কম্যুনিস্ট, মুসলমান যার কাছেই যাক–যদি বলে, চাকরী করব তবে আমি খেয়ানত করি, তাহলে এমন লোককে কেউ রাখবে না। মিথ্যা বলি, যুলুম করি–একথা বললে কেউ রাখবে না। বোঝা গেল, সিফাত সবারই মাহবুব।

মেহনত ও দু'আ করতে করতে যখন চলব, বাতিল নিচে চলে যাবে, হকওয়ালা উপরে উঠে আসবে।

# # #

**অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে ফরিদাবাদ মাদরাসার মসজিদে তাশরীফ রাখেন ও তালাবাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন। ১২:১২ থেকে ১২:৫০ পর্যন্ত ৩৮ মিনিটের বয়ানের অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো–**

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ ইলম আসমান থেকে অবতীর্ণ করেন। এটা আল্লাহর খাস সিফাত। এ ইলমের উপর নেযামে আলম (বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা) কায়েম আছে। এ ইলমের আযমত এত বেশি যে, এ ইলমওয়ালার চলার পথে ফেরেশতারা আপন ডানা বিছিয়ে দেন। পিঁপড়া, পশু, পাখি, সব তার জন্য ইস্তিগফার করে। নেযামে গায়েব এ ইলমের সামনে অবনত। আল্লাহ তা'আলা এক। তিনি আলিমুল গায়েব। তিনি সবার রব। এটা 'আ-ম'।

الحمد لله رب العلمين. رب السموت والأرض. رب العرش العظيم. رب المشارق والمغارب.

রব শব্দের মর্মে খানা-পিনা এবং রিযিকদানের বিষয়টিও শামিল। কিন্তু রবের আসল অর্থ হল, তিনি এমন সত্তা যার হুকুমে গোটা বিশ্বজগতের নেযাম কায়েম আছে। তিনিই প্রতিটি জিনিসকে যথাযথভাবে কায়েম করেছেন।

এ ইলম এমন যা দুনিয়ায়ও কামিয়াবী নিয়ে আসে, আখেরাতেও কামিয়াবী নিয়ে আসে।

একবার কিছু যুবকের সমুদ্রে ভ্রমণ করার শখ হল। তারা নৌকায় চড়ল। নৌকা যখন মাঝদরিয়ায়, তারা মাঝিকে জিজ্ঞেস করল,

–চাচা! জিওগ্রাফী (ভূগোল) জানেন?

–না।

–আপনি তো বেশ গাফেল লোক! আচ্ছা, ইতিহাস জানেন নিশ্চয়ই?

–না।

–তাহলে আপনি কীভাবে হুকুমতের বিষয়াদি বুঝবেন?

–সাইন্স জানেন?

–সাইন্স আবার কি জিনিস?

–চাচা মিয়া! আপনার জীবনটাই বেকার। এভাবে বলে আর ছেলেরা হাসে...। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে,

–আচ্ছা অ্যালজ্যাবরা, জিওমেট্রি, ফিলোসফি এগুলোর কোনোটা?

–না, না, না...।

–আপনার জন্ম হওয়া-না হওয়া সব সমান।

একটু পর সমুদ্রের বুকে জোরে বাতাস বইতে লাগল। শুরু হল ঝড়। নৌকা ডোবার উপক্রম। এবার মাঝি বলে,

–আর পারলাম না বাপুরা, নৌকা এবার ডুববে, ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হও। ভাল কথা, তোমরা সাতার জান তো?

-নান্ নান্ না, সবই জানি কেবল ওই সাঁতারটা ছাড়া।

মাঝি বলে, তাহলে এখনই বোঝা যাবে, জীবনটা তোমরা নষ্ট করেছো, নাকি আমি?

এমনিভাবে মউতের সময় বহু (ডিগ্রীধারী) লোক Fail হবে।

যে ব্যক্তি কালিমার উপর মেহনত করেছে, আল্লাহর কুদরত, সুন্নাতকে চিনেছে সে কামিয়াব। সে কবরে কামিয়াব হবে। কবরে সাইন্স, অ্যালজ্যাবরার প্রশ্ন হবে না। কবরে তিন সওয়াল হবে। যে দুনিয়ায় অবস্থানকালীন উত্তর দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে-ই পারবে উত্তর দিতে।

প্রথম প্রশ্ন : من ربك؟ তোমার রব কে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : وما دينك؟ তরীকায়ে হায়াত কী ছিল?

তৃতীয় প্রশ্ন : و من هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ এক রেওয়ায়েত মোতাবেক– ومن نبيك؟ তোমার নবী কে?

এ তিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে কামিয়াব; নয়তো না–কাম।

আর কেয়ামতে হবে চার সওয়াল। এক রেওয়ায়েতে আছে পাঁচ সওয়াল। যে জবাব দিতে পারবে সে কামিয়াব; অন্যথায় না-কাম।

১. জীবন কোথায় খরচ করেছো? (এক একটি মিনিট কোথায় কোথায় খরচ করেছো?)

২. যৌবন কোথায় খাটিয়েছো? (ইসলামের কাজে, নাকি লড়াইয়ে-যুলুমে?)

৩. আয় করেছো কোন্ পথে, ব্যয় করেছো কোন্ খাতে?

৪. হালাল-হারাম, হক ও বাতিল জেনে আমল কতটুকু করেছো?

এই যে ইলমে দীন, এর মধ্যে এই চার প্রশ্নের জবাব আছে।

মোটকথা কবরে এ ইলম কামিয়াব করবে। কেয়ামতেও কামিয়াব করবে। এ ইলম এত কামিয়াব করবে যে, যে শিশুকে এ ইলম শেখানো হবে তার মা-বাবাকে এমন তাজ পরানো হবে, যার রশ্মি সূর্যের চেয়েও বেশি হবে। তাহলে আমল করনেওয়ালাকে কী দেয়া হবে? হাজারগুণ বেশি। উস্তাদকে কী দিবে? আরও বেশি দারাজাত। শর্ত হল, এ ইলমের কদর করতে হবে। মূল্যায়ন করতে হবে। কীভাবে?

১. ইলমে দীন হাসিলের তাওফীক পাওয়ার পর দুনিয়ায় আর যত ইলম ও আলেম (জাগতিক বিদ্যা ও জাগতিক বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ) আছে সেগুলোকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করতে হবে; নয়তো দীনী ইলমের না-কদরী করা হবে। দীনী ইলম হাসিল করনেওয়ালা হল বাদশাহ। সে কারখানাওয়ালা, মালওয়ালার চেয়ে উঁচু। সারা দুনিয়ার মাল-মাত্তাধারীর চেয়েও সে উঁচু। তাদের কোন হাইসিয়্যাত আর গুরুত্বই আমার কাছে থাকবে না। তাহলে বুঝা যাবে যে, এ ইলমের কদরদানী করা হলো।

২. দেখতে হবে, এ ইলম হাসিল করতে কত মুজাহাদা করা হলো, কি পরিমাণ কুরবানী করা হলো। এ ইলম হাসিল করতে আসহাবে সুফ্ফা ক্ষুধার্ত বসা থাকতেন।

৩. এ ইলমের কদরদানী হবে যখন তা হর-হালতে হাসিল করা হবে। ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু কিতাব দেখছে। আল্লাহ এমন তালিবে ইলমের দিলে ইলমের আযমত ঢেলে দিবেন।

৪. এ ইলমের কদর বাড়বে যখন তার সদ্ব্যবহার করা হবে। গোমরাহকে হিদায়াতের পথে, যে নামায পড়ে না তাকে নামাযে, যে রোযা রাখে না তাকে রোযা রাখানোতে, যে যাকাত দেয় না তাকে যাকাত আদায়ে, যে হজ্জ করে না তাকে হজ্জ পালনে, মিথ্যাবাদীকে সত্যে, যালিমকে ইনসাফে আনার মেহনত করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা ইলমে তরক্কী দিবেন।

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أخرين.

কুরআনের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কওমের উপর মুসলমানদেরকে বুলন্দ করবেন যাদের উপর মেহনত করা হয়। যাদের উপর মেহনত করা হয় না, তাদের উপর বুলন্দ করবেন না।

তবে শর্ত হল কিছু আদব মানতে হবে।

এক. উস্তাদের আদব ।

ক. আকীদাত : উস্তাদ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।

খ. মহব্বত : উস্তাদকে মহব্বত করতে হবে। তিনি আমার রূহের যরিয়া, আমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার যরিয়া।

গ. খিদমত : উস্তাদের খিদমত করা। আগের যমানায় তালিবে ইলম খিদমত করেই ইলম হাসিল করতেন ।

যদি উস্তাদের আদব রক্ষা করে চলি, যত কমজোরই হই আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিবেন।

দুই. যেখানে পড়ি সেই মাদরাসার আদব।

মাদরাসায় দুনিয়ার আলোচনা না করা। অমুকে মন্ত্রী হয়ে গেল, অমুকে মারা গেল...। তাতে কী হয়েছে? ওসব না করে নিজে কী হলে সেটা দেখো, আম্বিয়া আ.-এর সীরাত দেখো, পড়ো; এতে ঈমান বাড়বে।

এটা মাদরাসা! এর আদবও যথাযথ রক্ষা করতে হবে। দুনিয়ার কিস্সা করতে করতে কাপড় ধোব না। দীনের কথা বলতে বলতে কাপড় ধোব তাহলে কাপড়েও বরকত হবে।

তিন. ইলমের আদব।

আগের যমানায় তালিবে ইলমের হিদায়াতের ফিকির থাকত। আল্লাহ রাজি হয়ে যান, দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা বিস্তার লাভ করে–এ জযবায় তারা চলতেন। ঈমানের দাওয়াত দাও। আল্লাহর আহকামাত শিখো, দীন শিখো; বরকত হবে।

আল্লাহর হুকুমের খেলাফ হলে বড় বড় ফ্যাক্টরীও Fail হয়ে যায়। বস্তুত এটা সেই ইলম, যা বলে দিবে কোন রাস্তায় চলনেওয়ালা কামিয়াব আর কোন রাস্তায় চলনেওয়ালা না-কাম।

ইলমে দীনের উপর এই আকীদা ও আস্থা রাখি যে, এটা আমাকে অবশ্যই সাফল্য দান করবে।

ফিরআউন বলেছিল,

يقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانهر تجرى من تحتى افلا تبصرون

(অর্থ :) হে আমার কওম! মিসরের রাজত্ব আমার হাতে নয়? এবং এইসব নদ-নদী আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? (সূরা যুখরুফ- ৫১)

ফেরআউন, কারুন, শাদ্দাদ–এদের ইলম এদেরকে না-কাম করেছে। সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-কে তাদের ইলম কামিয়াব করেছে। তাঁরা ইলম নিচ্ছিলেন ও দাওয়াত দিচ্ছিলেন। বস্তুত যে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করে, আল্লাহ তাকে বুলন্দ করেন।

চার. সব কাজ আদবের সাথে করা। সুন্নাত তরীকায় করা। ঘরে প্রবেশ করতে, বাজারে যেতে দু'আ পড়ি। খানা খেতে দু'আ পড়ি। সুন্নতের পাবন্দী করলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে। দিল ঘাবড়ে গেলে এই দু'আ পড়ি–

الله الله ربى لا أُشرك به شيئاً

কেনা-বেচার ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পড়ি– لا خلابة ইনশাল্লাহ, আর কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিন বার পড়ে নেই– اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

ঋণগ্রস্ত হলে দু'আ পড়ি– اللهم إنى اعوذبك من الهم والحزن واعوذبك من الجبن والبخل واعوذبك من غلبة الدين وقهر الرجال.

যদি দীনের মেহনত করি ও দু'আ করি তাহলে আমাদের সব দু'আ কবুল।

# # #

বয়ান শেষে দাওরা জামা'আতের ছাত্রদেরকে পরীক্ষার পর সালে বের হওয়ার জন্য মিনিট দশেক তাশকীল করেন। অন্যদেরকে রামাযানে চিল্লার তাশকীল করেন এবং সকলকে মাসে একবার '২৪ ঘণ্টা' জামা'আতে বের হওয়ার এবং দৈনিক আসর হতে মাগরিবের অর্ধেক সময় দাওয়াতে ব্যয় করার তাশকীল করে চার মিনিট (০১:০১ হতে ০১:০৫ পর্যন্ত) দু'আ করেন।

তারপর কাকরাইলে ফিরেই তিনি সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করলেন। ফ্যান লাগানো হয়েছে কিনা যাচাই করলেন। দেখা গেল, দোতলায় মূল মসজিদের অর্ধেকটায় ফ্যান লেগে গেছে। আর পূর্বদিকে বারান্দার অংশে ফ্যান লাগানো হয়নি। জানতে চাইলেন, এখানে ফ্যান কখন লাগানো হবে? বলা হল, অবিলম্বেই লেগে যাবে। তিনি মেনে নিলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-কে জাযায়ে খায়ের দান করুন। মদীনা মুনাওয়ারায় জান্নাতুল বাক্বীতে তার কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন। তার সমস্ত উত্তম কথাগুলো হাকীকতের সাথে ও দাওয়াতের সাথে উত্তমভাবে আমল করে আমাকে, আমার স্ত্রী, সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও নসলকে, পাঠককে ও কেয়ামত তক আনেওয়ালা সারা বিশ্বের সমস্ত উম্মতকে উভয়জগতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

**(৪৩ পৃষ্ঠার পর; সোজাসাপটা)**

ছেঁড়া জামা পরেই রওয়ানা হলাম। কারণ আমার আগ্রহ খুবই নড়বড়ে। একটু এদিক-সেদিক বা বিলম্ব হলেই মাথায় ভিন্ন ঝোঁক বাসা বাঁধে।

জ্যাম নেই। মুহূর্তেই সিএনজি মাদরাসার সামনে চলে এলো। ভাড়া চুকিয়ে তড়িঘড়ি রাস্তা পার হলাম। কিন্তু কোথায় মাহফিল! মাইকের বিকট আওয়াজ নেই। লোকাল স্ট্রিটফুডের পসরা নেই। চারপাশ প্রায় অন্য সময়ের মতোই শান্ত ও শোরগোলহীন। মাহফিল হচ্ছে বোঝার উপায়ই নেই। মার্কেটের মাঝ বরাবর ছোট প্রবেশদ্বার পার হলাম। এবার মাইকের আওয়াজ পেলাম। দেশবরেণ্য একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমে দীনের ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। প্রতিধ্বনিহীন সম্পূর্ণ একটি স্বর। স্বরে স্বরে সংঘর্ষ বেধে আওয়াজ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না। কারণ পুরো প্যান্ডেলে একটি মাইকই লাগানো হয়েছে। মাঝারি মাঠে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনছে। পুরো মাঠজুড়ে কেমন এক জান্নাতী আবেশ, সব কিছুতেই একটা নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা। এই মাহফিলে শরীক হয়ে সেই ভোগান্তির সকল ফোকর প্রশান্তিতে ভরে গেল। মন বলে উঠলো, এই না হলো মাহফিল! সকল হকপন্থি মাহফিলগুলো এমন হয় না কেনো? মাহফিল হলেই কেন পুরো পথে মাইক দিয়ে জোর করে ওয়াজ শোনাতে হবে? সড়ক-মহাসড়ক আটকে কেন মাহফিল করতে হবে? কেন উগ্র ভলান্টিয়ারদের দিয়ে আগত মেহমানদের সাথে নিয়ন্ত্রণের নামে রূঢ় আচরণ করাতে হবে?

আরেকটি মাহফিলের কথা মনে পড়ে গেলো। বিশাল সে মাহফিল। হাজার হাজার আলেম-উলামা তাশরীফ রাখেন, বয়ান করেন। এ মাহফিলে সবার জন্যই মেহমানদারীর ইন্তেযাম করা হয়। মেহমানখানায় মেহমান ও ডেগ-ডেকচির প্রবেশ ও নির্গমন পথ একটি হওয়ায় খানার জন্য অপেক্ষমান উপচেপড়া জনতাকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো। নির্বাক হয়ে গেলাম যখন মেহমানদের ওপর উগ্র ভলান্টিয়াররা মিছিলে হামলে পড়া লাঠিবাজ পুলিশের মতো হিংস্র হয়ে উঠলো। এই নির্লজ্জ আচরণে অনেকেই লজ্জায় স্থান ত্যাগ করলো। দাওয়াত করে ব্যবস্থাপনাহীনতার মাধ্যমে একটি হকপন্থি আয়োজনে মেহমানদেরকে এভাবে অপমান করা কতোটা জঘন্য ব্যাপার!

মাহফিলগুলোতে অতিথিদের পরিচিতির নামে প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়ানো ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে ডুবে থাকাকেও বড়রা ভালো চোখে দেখেন না। ভণ্ডদের আসর থেকে আহলে হকের মাহফিলেও এসব নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করে এখন অনিবার্যতার মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছে।

রসমী ওয়াজ-মাহফিল, ভণ্ডদের ওরশ, বয়াতী ও বাউল গানের আসর থেকে যতো দ্রুত আমাদের হকপন্থি মাহফিলগুলোর ব্যবস্থাপনাগত পার্থক্য সৃষ্টি করা যায়, ততোই এই মাহফিলগুলো আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ও হেদায়াতের নিয়ামক হতে পারে। আমরাও যদি ওদের মতো করতে শুরু করি তাহলে গর্বের জায়গাটা থাকলো কই?

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

# ইন্টারনেট ব্যবহার : কিছু সতর্কতা

মাওলানা মাসউদ সাহেব দা.বা.

বর্তমানে একশ্রেণীর লোক প্রায়ই আমাদেরকে বলেন, 'মাওলানা সাহেব, বর্তমান যুগ তো কম্পিউটারের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, কিন্তু আপনারা যুগের চাহিদা ও দাবী উপেক্ষা করে কুরআন হাদীস নিয়ে পড়ে আছেন! আপনারা ইন্টারনেটে বেশি বেশি সময় দিন এবং এর প্রতি সবিশেষ যত্নবান হোন। বর্তমান যুগে দীনের খেদমতের জন্য এবং দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য এর চেয়ে বড় কোন মাধ্যম নেই। দীনী মাদরাসাগুলো তখনই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে যখন তারা তাদের শিক্ষা কারিকুলামে ইন্টারনেটকে অগ্রাধিকার দিবে।' আর কিছু লোক তো আরেকটু আগে বেড়ে বলে, 'আপনারা এখনো কুরআন-সুন্নাহর কথা বলেন, অথচ সারা দুনিয়া ভার্চুয়াল জগতে বিচরণ করছে!'

আজকাল এ ধরনের কিছু কথা প্রায় সবখানেই আমাদের কানে বাজে। সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আমাদেরকে এগুলো শোনানো হয়। তারপরও কেন যেন কথাগুলো আমাদের মন-মস্তিষ্কে বিন্দুমাত্রও প্রভাব সৃষ্টি করে না; যেন সেগুলো আমাদের কানেই প্রবেশ করে না। ইন্টারনেটের যে বিশেষ কিছু উপকার রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে আমাদের দৃষ্টিতে উপকারের চেয়ে এর ক্ষতির দিকটিই বেশী; বরং অনেক বেশী। মুসলমানদের জন্য বিশেষত আলেম-উলামা ও তালিবুল ইলমের জন্য ইন্টারনেটে সীমাতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং এটাকেই কাজের একমাত্র মাধ্যম বানানো এবং নিজেকে এর মধ্যে একেবারেই আবদ্ধ করে ফেলা সীমাহীন ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব সত্য হল, এই ক্ষতিকর যন্ত্রের বহুবিধ ক্ষতিই এখন ধীরে ধীরে সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানে ইন্টারনেটের মন্দ পরিণতি ও ক্ষতিকর কিছু দিক উল্লেখ করা হল–

এক. বর্তমানে ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং এর কুপ্রভাব আমাদের যুবসমাজের মধ্যে হেরোইন-পেথিড্রিনের নেশার মত ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্টারনেটের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামী তাদের মন-মস্তিষ্ক ও শারীরিক সক্ষমতায় প্রতিনিয়ত আঘাত করে যাচ্ছে। আপনারা যদি বিনোদনের নামে ইন্টারনেটভিত্তিক অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামির মাধ্যমে নিজেদেরকে অপদস্তকারী যুবকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে আপনাদের এই আফসোস ও অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, এই যুবকেরা এতোটাই নির্বোধ ও হতভাগ্য যে, এরা না দুনিয়ার কোন কাজে আসছে, না আখেরাতের কোন কাজে আসছে! অপরিণামদর্শী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রায় সকলেরই সূচনা হয় তথ্য অনুসন্ধানের অজুহাতে। আর এর সমাপ্তি হয় ঈমান-আমল, লজ্জা-শরম, জীবন-যৌবন ধ্বংস করা এবং এমন এমন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যা উল্লেখ করারও যোগ্য নয় এবং কোন ভাষায়ও তা প্রকাশ করা যায় না। মানবজাতির মনুষ্যত্ব ও সুকুমারবৃত্তি ধ্বংসকারী বিষ-ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সভ্যতার উপর অনবরত বিষ ঢেলে যাচ্ছে। আমাদের নির্বোধ, অসচেতন যুবকেরা সেই বিষাক্ত ছাইপাশ মজা করে চুষে খাচ্ছে। অতঃপর নিজেকে লাঞ্ছনা, অপদস্ততা ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে।

অত্যন্ত আফসোস আর পরিতাপের বিষয়, শহর-নগর পেরিয়ে এখন আমাদের গ্রাম-গঞ্জেরও অলিতে গলিতে সাইবার ক্যাফে খোলা হচ্ছে। আমাদের যুবসমাজ দলে দলে ঐ সব সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে।

দুই. সমাজের ধর্মভীরু দীনদার শ্রেণীর অনেক মুসলমান ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে বে-আমল, এমনকি বদদীন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রথম দিকে তারা দীনের খেদমতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করেছিল। অতঃপর তাদের মাথায় সওয়ার হয় অধিক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করার ভূত। একপর্যায়ে তারা নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী ভাবতে শুরু করে। আর এভাবে নিজেদের জীবনের মহামূল্যবান সময়গুলো ইন্টারনেটের পেছনে নিঃশেষ করতে থাকে। পরিশেষে বিষয়টি এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, তারা আর কোনও কাজের যোগ্য থাকে না। কিছু কিছু লোক তো এমনকি পারিবারিক যিম্মাদারী বা দায়িত্ববোধের ব্যাপারেও বিলকুল উদাসীন হয়ে যায়। ইন্টারনেটের সূক্ষ্ম ও স্লো-পয়জন তাদের অভ্যন্তরীণ স্বভাবগত যোগ্যতা, সুপ্ত প্রতিভা ও কর্মোদ্যম একেবারেই নিঃশেষ করে দেয়। অবশেষে তারা অনর্থক কথাবার্তা ও বেহুদা কাজকর্মে লিপ্ত হয় কিংবা নিজেদেরকে ইন্টারনেটের গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে মহামূল্য জীবনটাকে ধ্বংস করতে থাকে।

তিন. ইন্টারনেটের মাধ্যমে দীনী জ্ঞান অর্জনকারী বহু লোক ইসলামবিরোধী গোষ্ঠির পক্ষ থেকে দীনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা বিভিন্ন আপত্তি, সংশয় ও কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে যায়। সমাজে আপনারা এমনও বহু লোককে পাবেন যারা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তথ্যের উদ্বৃতি দিতে থাকে এবং সেগুলোকে মানুষের কাছে কুরআন-হাদীসের মত উপস্থাপন করে ভ্রষ্টতা প্রচার করতে থাকে। তাদের কিছু লোক তো সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে, আর কিছু আছে আধা-পাগল। আপনারা যদি তাদের সামনে কুরআন মাজীদ কিংবা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে কোন কিছু পেশ করেন, তারা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দেয় আর বলতে থাকে, আমরা ইন্টারনেট থেকে কথা বলছি আর আপনারা আদিযুগের কথা বলছেন!?

চার. ইন্টারনেটের অতি ব্যবহার কিছু লোকের মেধাগত যোগ্যতাকে অবশ ও বিকারগ্রস্ত করে দেয়। যারা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অধিকহারে ব্যবহার করে তাদের অনেকের মেধাগত সক্ষমতাও বিগড়ে যায়। তাছাড়া কম্পিউটারের স্ক্রীনের আলোও তাদের চোখের জ্যোতি ও দেমাগ বিনষ্ট করতে থাকে।

পাঁচ. মানুষ স্বভাবগতভাবেই অধিক পরিমাণে তথ্য জানার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়ত এ ব্যাপারে কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কেননা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সব মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য তথ্যভাণ্ডার থেকে কোন্টা কার জন্য জানা মঙ্গলজনক আর কোনটা অমঙ্গলজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও বহু মানুষের সাধ্যের বাইরে। বস্তুত এটা নির্ণয় করা সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের মন-মস্তিষ্কে ঐ সমস্ত বিষয়েরও চিত্রায়ন করতে থাকে যা ভবিষ্যতে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর কুমন্ত্রণা

এবং ধ্বংসাত্মক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এগুলো ছাড়াও ইন্টারনেটের আরো বহুবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি সমাজের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমাদের চোখের সামনেই মুত্তাকী, পরহেযগার বহু যুবক ইন্টারনেটের নেশায় পড়ে অকর্মণ্য, বে-আমল এবং বদদীন হয়ে গেছে। এমনকি কিছু দীনী প্রতিষ্ঠানও স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার স্রোতে ভেসে গেছে। এমনিভাবে ইন্টারনেটের অকল্যাণে আমাদের সমাজে এমন একটি শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষায় তাদেরকে দীনদারই মনে হয়; কিন্তু তাদের দীন ইন্টারনেটের উদ্ধৃতি, অহেতুক আলোচনা এবং অন্যদেরকে মুর্খ ও নির্বোধ মনে করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতার শিকার লোকদের এক মহাপ্লাবন মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য সমূলে ধ্বংস করার জন্য অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই নাযুক পরিস্থিতিতে দীনী প্রতিষ্ঠান এবং দীনী খেদমতে রত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব হল, তারা ইন্টারনেটের ব্যবহারকে সীমিত আকারে, সংরক্ষিত উপায়ে, সঠিকভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করবে।

**সংরক্ষিত উপায়ে সঠিক পন্থায় ইন্টারনেট ব্যবহারের কিছু পদক্ষেপ**

এ মুহূর্তে যেহেনে আসা কিছু পদক্ষেপের দিকে মনোনিবেশ করা আমাদের সবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় মনে করছি–

**এক.** ইন্টারনেটের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নোংরামি এবং এর বিভিন্ন খারাবী ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে নিজেদের ঘনিষ্ঠজন ও সাধারণ মুসলমানদের অনুভূতিকে জাগ্রত করে তোলা। সর্বোপরি মুসলিম সমাজের প্রতিটি স্তরে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সচেতনতা তৈরি করা। তাদেরকে এটা বোঝানো যে, ইউরোপের এই ঝলমলে সাপ কিন্তু মারাত্মক বিষাক্ত। বরং তাদেরকে অত্যন্ত সততা ও প্রজ্ঞার সাথে এ কথা বোঝানো যে, সাপে কাটা রোগী সাধারণত চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভব করে এবং চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়। পক্ষান্তরে ইন্টারনেটে দংশিত ব্যক্তি চিকিৎসার প্রয়োজন তো অনুভব করেই না; বরং কোন কোন সময় নিজেই সে সাপ হয়ে যায়। তা-ও যেনতেন সাপ নয়; মারাত্মক বিষাক্ত ও ভয়ঙ্কর সাপে পরিণত হয়। অর্থাৎ সাপে কাটা ব্যক্তি বিষক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, পক্ষান্তরে ইন্টারনেটে আসক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার বোধটুকুও জাগ্রত হয় না। বরং তার মাধ্যমে সমাজে এই বিষ ও বিষক্রিয়া আরো ছড়িয়ে পড়ে।

**দুই.** ইন্টারনেট ব্যবহারকারী লোকদেরকে এটা বোঝানো যে, তারা দীনী প্রয়োজনের সময় সীমিত পরিসরে এর ব্যবহার করবে এবং কাজ শেষে তা বন্ধ করে রাখবে। এমনিভাবে যারা কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তারা কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগী কিংবা অধীনস্তদেরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখবেন। পাশাপাশি নিজ নিজ পিসি, ল্যাপটপ ও মোবাইলে ইন্টারনেটের অশ্লীল ও নোংরা পোগ্রামগুলোকে অকেজো করে দেয় এমন কোন অ্যাপ/সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিবেন। সে সঙ্গে নিজেদের এবং সহযোগীদের রূহানী তরবিয়ত তথা আত্মসংশোধনের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হবেন।

**তিন.** দীনী কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী না বানানো এবং যে কোন কাজের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া। অন্যথায় ধীরে ধীরে কাজের যোগ্যতা ও শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজনের সময় জরুরতের গণ্ডির মধ্যে থেকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এটাই কাজের একমাত্র মাধ্যম না হয়ে পড়ে এবং এটারই উপর নির্ভর করে থাকতে না হয়।

**চার.** কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ইসলামী রীতিনীতি তথা তাকওয়া অর্জন এবং সদা-সর্বদা আখেরাতের ফিকির অন্তরে জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করা।

**পাঁচ.** নিজেদের বয়ানে, লেখায় কিংবা কোন মজলিসে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ে এমনভাবে আলোচনা না করা, যার ফলে নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে ইন্টারনেটের প্রভাব কুরআন-সুন্নাহর চেয়েও বেশী হয়ে যায় এবং তারা এর ব্যবহারকে উন্নতি-অগ্রগতি এবং বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ হওয়ার অনিবার্য উপকরণ মনে করে।

**ছয়.** ইন্টারনেটে নিজেদের মহামূল্যবান সময় বিনষ্টকারী দীনদার মুসলমাদেরকে এর মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য দাওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে প্রজ্ঞার সাথে এই উপদেশ দেয়া যে, ইন্টারনেটে বসে বসে জ্ঞান অর্জন করার পরিবর্তে তারা যেন ঐ সময়টুক কুরআন-হাদীস নিয়ে উলামায়ে কেরামের সোহবতে বসে দীনের সহীহ বুঝ বা জ্ঞান অর্জন করে।

**সাত.** যারা আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী, যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এবং ইন্টারনেটে দীনী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন তারা সঠিক চিন্তাধারার দীনী বিষয়াদির ব্যবস্থা চালু করবেন। পর্যায়ক্রমে এর ব্যবস্থা আরো বৃদ্ধি করবেন। তারা বিভিন্ন মজলিসে নিজেদের অনুসরণকারী ভক্তবৃন্দদেরকে এই উপদেশও দিবেন যে, নির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুলো ব্যতীত তারা যেন অন্য কোন প্রোগ্রামে প্রবেশ না করে বা না দেখে। বরং যেমনিভাবে সাহিত্য বিষয়ক বই-পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ কিংবা যে কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য পরহেযগার বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ, ঠিক তেমনিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্যও (চাই সেটা যে উদ্দেশেই হোক) মুরুব্বী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে অনুমতি নেওয়া উচিৎ।

**আট.** দীনী খেদমতে রত ব্যক্তিগণ সদা-সর্বদা নিজের মন-মস্তিষ্ক ইন্টারনেটের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন এবং নিজের স্বভাবগত যোগ্যতা, সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে, কাজে লাগিয়ে বেশি থেকে বেশি দীনী কাজ আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করবেন।

নয়. দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংরক্ষিত উপায়ে সীমিত কিছু লোকের দায়িত্বে দেয়া এবং প্রতিদিন ইন্টারনেট 'ইউজার হিস্ট্রি' চেক করে দেখা যে, গতকাল এর মাধ্যমে কোন অনৈতিক বা অবৈধ কিছু দেখা হয়েছে কি না? স্মরণ রাখবেন, ইন্টারনেট ব্যবহারের রেকর্ড এর মধ্যেই সংরক্ষিত থাকে। বাহ্যিকভাবে রেকর্ড মুছে ফেলা হলেও রিকভারি সফটওয়্যারের মাধ্যমে খুব সহজেই এটা বের করে দেখা সম্ভব যে, অতীতের দিনগুলোতে কখন, কী দেখা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের এই ব্যবস্থা ইন্টারনেটের অনৈতিক বা অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ অনেক ফায়দাজনক ও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

দশ. পরিপূর্ণ দীনী অনুভূতি ও শিক্ষা গ্রহণ না করা লোকজন এবং অল্প বয়সী শিশুদেরকে কিছুতেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

অনুবাদ : মুহাম্মাদ যুবায়ের কুমিল্লা
শিক্ষার্থী, ইফতা (২য় বর্ষ) জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

# ইসলামী আইন : প্রসঙ্গ বাল্যবিবাহ

মাওলানা হাফিজুর রহমান

**(পূর্ব প্রকাশিতের পর)**

বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পেই হয়তো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা নিঃসন্দেহে যথাস্বীকৃত। কিন্তু বাল্যবিবাহের কারণে সামাজিক যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিচ্ছিন্ন দু-একটি সমস্যার সমাধানকল্পে পুরো বিবাহ ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কতটা যৌক্তিক তা বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ সমাজে এমন অনেক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হন। এ জন্য ইসলামী আইনে বাল্যবিবাহের ব্যাপারটিকে উন্মুক্তভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। **এখানে বাল্যবিবাহের ব্যাপারে কোনোরূপ উৎসাহ প্রদান করা হয়নি এবং এব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়নি।**

আমরা গ্রামের সবুজ পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। আমাদের শৈশব-কৈশোর আমতলা-জামতলা আর নদী-নালা, খাল-বিলে দৌড়-ঝাঁপ করেই কেটেছে। বাল্যবিবাহের সমস্যাগুলোকে যেভাবে আজ ফলাও করে প্রচার করা হয় তার কিয়দাংশ আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে প্রত্যক্ষ করিনি। আইন প্রণয়নোত্তর আজ সমস্যার হার বের করতে জরিপ চালানো হচ্ছে। তো সে জরিপ তো আইনের অনুগামী করেই প্রস্তুত করা হবে। বলা হচ্ছে, বাল্যবিবাহের ফলে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তো নারীশিক্ষা বৃদ্ধি করার কি আর কোনো উপায় নেই? একটি বৈধ বিষয়কে নিষিদ্ধ করে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে? একসময় অমুসলিমরা মুসলিমদের কাছ থেকে প্রকৃত সভ্যতার পাঠ গ্রহণ করত। আজ মুসলিমরা অমুসলিমদের থেকে যতসব অসভ্যতা আর অপসংস্কৃতির কারিকুলাম রপ্ত করছে। অমুসলিমরা একটি আইন করছে আর সে আইন আমরা কোনো বাছ বিচার ব্যাতিরেকে লুফে নিচ্ছি। এখন ওরা দাতা আর আমরা গ্রহীতা। এ যেন 'সকালবেলার ধনী রে তুই ফকীর সন্ধ্যাবেলা।'

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি ধাপ রয়েছে, (১) প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই অভিভাবক বালক বা বালিকাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। বিবাহের ব্যাপারে বালক-বালিকার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে বিবাহ চুক্তিকালে তারা কিছু বলতে পারে না বা বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করার পর তাদের মাঝে পছন্দ অপছন্দসহ নানা রকম রুচিবোধের সৃষ্টি হয়। তো রুচির তারতম্যের কারণে বরের কনে বা কনের বর পছন্দ না-ও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ককে আইনগতভাবে অবিচ্ছিন্ন ও বহাল রাখা হয় তবে তাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হবে না। তাদের সুখময় জীবনের জন্য এ বিবাহ কাল হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামী আইনে বৈবাহিক এ সঙ্কট সমাধানের জন্য 'খিয়ারে বুলুগ'-এর অপশন রাখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর বর কনের জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যাসাপেক্ষে পূর্বোক্ত বিবাহ বন্ধন বিলুপ্ত করার অধিকার থাকবে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আজ বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সবই ইসলামী আইনের বৈবাহিক নীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে হয়ে থাকে।

(২) প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর **১৮-২১** বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যুবক যুবতীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি সক্ষমতা এবং বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে বিবাহটি সংঘটিত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে এ বিবাহের কারণে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় তবে বিবাহ না করার কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হতো। সে সমস্যাটা বিবাহোত্তর উক্ত সমস্যা থেকেও অধিক গুরুতর হতো। আর যদি সক্ষমতা এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে এ বিবাহের আয়োজন হয়ে থাকে তবে এ জাতীয় বিবাহের অনুমতি ইসলামী আইনে নেই; বরং এটা বিবাহকারী বা বিবাহ পরিচালনাকারী অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফল। অপ্রয়োজনীয় বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার সমাধান আইন নয়; বরং নৈতিক সুশিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসারই এ জাতীয় সমস্যার সমাধানের বার্তা বয়ে আনতে পারে। বস্তুত অশিক্ষা ও অপসংস্কৃতিই অপ্রয়োজনীয় বাল্যবিবাহের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

সারকথা, বাল্যবিবাহকে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া বাল্যবিবাহপ্রসূত সামাজিক সমস্যার প্রকৃত ও সুষ্ঠু সমাধান নয়; বরং এতে আরো হাজারো সমস্যার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। এর সুষ্ঠু সমাধান হলো, শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার করা। বিশেষত ইসলামী পারিবারিক শিক্ষানীতির ব্যাপক প্রচার প্রসার করা। যাতে শিশু কিশোরেরা উপলব্ধি করতে পারে ইসলামী আইন তাদেরকে কি পরিমাণ সুযোগ প্রদান করেছে। এখন কেউ যদি অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ইসলামী আইনের সুবিধা ভোগ না করে তবে সেটা আইনের দোষ নয়। এ কারণে তো আইনের উপর সংস্কার ও সংশোধনীর খড়গ চালানো যায় না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। (হামারে আয়েলী মাসায়েল; পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৫ অবলম্বনে)

**নতুন প্রজন্মের অপরাধপ্রবণতা**

ড. গুড়চ সি শুফলার **১৯৫৪** সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর সামনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন, উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের যৌন আবেগ-অনুভূতি মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

ইটার্নি জেনারেল ক্লার্ক ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এর উদ্ধৃতিতে বলেন, 'হত্যা, প্রতারণা এবং ব্যভিচার সংঘটনের ক্ষেত্রে সতের বছর বয়সী যুবক যুবতীরাই সবচাইতে বেশি জড়িত। বিশেষত শতকরা ত্রিশ পার্সেন্ট অবৈধ যৌন অপরাধের সাথে সতের বছর বয়সী যুবক যুবতীরা জড়িত। এটা তো শুধু ঐসব যুবক যুবতীদের কথা যারা অবৈধ যৌনাচারের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে।'

নিনা অ্যাপ্টন তার লাভ অ্যান্ড দ্য ইংলিশ গ্রন্থে জনৈক ইউরোপিয়ান স্কুল মাস্টারকে উদ্ধৃত করে রিপোর্ট করেন, 'আমার স্কুলের শিশুদের মাঝে পাঁচ বছর বয়স থেকেই কোর্টশিপ তথা প্রাকবৈবাহিক যৌনতার চর্চা শুরু হয়ে

যায়। সেখানে আপনি অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের পরস্পরকে 'আহ্বান' করতে দেখতে পাবেন। বিশেষত যে সব শিশুদের কোনো বোন নেই তারাই সবচাইতে বেশি পরিমাণে 'যৌনক্রীড়া'য় লিপ্ত হচ্ছে।'

অন্যত্র স্কুল শিক্ষক বলেন, 'এখানকার উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে যৌন চর্চা এত বেশি পরিমাণে হয় যে, তার পরিসংখ্যান আমি তুলে ধরতে পারবো না। আর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সরকারী রিপোর্ট মতে প্রতি পঞ্চাশ জন মানুষের মধ্যে একজন মেয়ে শিশু অবশ্যই এমন রয়েছে যে সতের বছর বয়সের পূর্বে সন্তান প্রসবের আশা পোষণ করতে পারে।'

উপরোক্ত রিপোর্ট উদ্ধৃত করার পর নিনা অ্যাপ্টন লিখেন, 'এখানে এরকম অনেক ঘটনাও ঘটছে যে, এগার বার বছর বয়সেই মেয়েরা সন্তান প্রসব করেছে।' (নিনা অ্যাপ্টন, লাভ এ্যান্ড দ্যা ইংলিশ; পৃষ্ঠা ৩৩৮ [১৯৬০], হামারে আয়েলী মাসায়েল; পৃষ্ঠা ১৮৪, ৮৫)

**বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের অন্তরালে**

এটা তো স্বতঃস্বীকৃত যে, এ আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি প্রথমে কোনো মুসলিম আইনবিদের মাথায় আসেনি। অমুসলিম বিশেষত বৃটিশরা উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলে। তারা কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ আইনের আওয়াজ তুলে ছিল। তন্মধ্য হতে অন্যতম তিনটি উদ্দেশ্য হলো,

১. একথা প্রমাণ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম আয়েশা রাযি. কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করে এবং ফাতেমা রাযি. কে তের বছর বয়সে আলী রাযি. এর সাথে বিবাহ দিয়ে নারী জাতির উপর অন্যায় অবিচার করেছেন। তেমনিভাবে আলী রাযি. উম্মে কুলসুম রাযি. কে তের বছর বয়সে উমর রাযি. এর সাথে বিবাহ দিয়ে মেয়েদের উপর কঠোরতা করেছেন। এভাবে তারা ইসলামী আইনের উপর আঘাত হানার কার্যক্রম হাতে নেয়। (নাউযুবিল্লাহ)

২. উঠতি বয়সের মুসলিম তরুণ-তরুণীরাও ইউরোপ আমেরিকানদের অনুসরণ করে প্রবৃত্তির চাহিদা মত মুক্তমনা পরিবেশে জৈবিক আনন্দ বিনোদন করে কাটাবে। পরিশেষে তাদের জীবনযাত্রাকে বিষাক্ত করে তুলবে।

৩. মুসলিম তরুণীদের অল্পবয়সে বিবাহ হলে তারা মাতৃজীবনে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদান করবে। এতে মুসলিমদের জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাবে। সুতরাং একজন মুসলিম মা যেন তিনজনের অধিক সন্তান জন্মদান না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সে ব্যবস্থা হলো, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো মুসলিম তরুণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আর তাদের সন্তান ধারণের সর্বশেষ মেয়াদ হলো ৩৫ বছর। এরপর আর তারা গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারবে না। এবং দু'টি সন্তান গর্ভে আসার মাঝে পাঁচ বছর ব্যবধান থাকতে হবে। সারকথা মুসলিম তরুণীরা গড়ে তিনটির অধিক সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারবে না। (আবূ হুসাম তারফাবী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ ১/৪৬)

**অভিযোগ ও খণ্ডন**

ক্যাথলিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক নারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা স্মারক গ্রন্থে (পৃ. ৬৯-৭১) এবং *কিতাবুদ দালীল* নামক অন্য একটি গ্রন্থে (পৃ. ৮২) বাল্যবিবাহের ব্যাপারে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যথা,

১. বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গর্ভে সন্তান ধারণ করার ফলে মা এবং নবজাতকের উপর মারাত্মক ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

খণ্ডন : ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা এ অভিযোগ স্বীকার করে না। কারণ আবহমান কাল থেকেই ১৪-১৫ বছর বয়সী তরুণীদের বৈবাহিক ধারা চলে আসছে। অথচ তাদের অভিযোগের সত্যতা যথার্থ প্রমাণিত নয়। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তবে সেটা অন্য কোনো কারণে ঘটে থাকবে যা বিশ বা ততোধিক বছর বয়সী নারীদের বেলায়ও ঘটে থাকে।

২. সন্তান প্রতিপালন, পারিবারিক ও সামাজিক জ্ঞানের জন্য যে পরিমাণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বাল্যবিবাহ সে পরিমাণ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

খণ্ডন : (ক) পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, লেখকদের ব্যাপারে যদি অনুসন্ধান চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ মনীষীদের মায়েরাই সাক্ষর জ্ঞান ও পাঠ্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল না। তবে এসব মহামনীষীদের প্রতিপালনের দায়িত্ব কারা পালন করেছিল? ভিন্ন কোনো শিক্ষিত নারী?

(খ) যদি কর্মজীবী শিক্ষিত নারীদের সন্তানদের উপর জরিপ চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে তাদের অনেকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ এবং অসফল। পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে এদের নিয়ে প্রতিদিন লেখালেখি হচ্ছে। কারণ তারা শৈশবে মায়ের আদর-সোহাগ ও স্নেহ-ভালোবাসা পায় না। এদের মায়েদের সময় থাকে না তাদেরকে প্রতিপালন করার। ফলে তারা নার্স, আয়া বুয়াদের কোলেই অনাদর অবহেলায় বেড়ে উঠছে।

(গ) যদি পারিবারিক অশান্তি, অমিল সর্বোপরি পারিবারিক যাবতীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, এসবের অধিকাংশই কলেজ-ভার্সিটি পাশ করা শিক্ষিত নারীদের মাধ্যমেই সংঘটিত হচ্ছে। এখানে আমি শিক্ষার ব্যাপারে বিরূপ কোনো মন্তব্য করছি না এবং নারীশিক্ষার বিরুদ্ধেও বলছি না। তবে যে শিক্ষা নারীকে সন্তান প্রতিপালন, পরিবার পরিচালনা এবং স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে সেটা ঐ শিক্ষা নয় যা স্ত্রীকে স্বামীর মুখোমুখি হয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলতে সহায়তা করবে।

৩. বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা স্বামী এবং তার পরিবারের সাথে বোঝাপড়া করে চলতে পারে না। ফলে পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

খণ্ডন : (ক) এ সমস্যা একমাত্র বাল্যবিবাহের কারণেই সংঘটিত হয় না বরং এ জাতীয় সমস্যার জন্য অন্যান্য উপসর্গ দায়ী।

(খ) স্বামী বা পরিবারের সাথে বোঝাপড়া করে চলতে না পারার ব্যাপারটি ঐ সমস্ত নারীদের ক্ষেত্রে বহু গুণ বেশি সংঘটিত হয় যারা ১৮ বা ২০ এর কোঠা অতিক্রম করে বিবাহের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। কারণ তারা এতদিনে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনা লালন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এবং সে ব্যক্তিক ও চিন্তাগত চাহিদাগুলো স্বামীর কাছ থেকে যে কোনো উপায়ে আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর হয়। আর এখান থেকেই সূচিত হয় পারিবারিক কলহের প্রধান উপজীব্য। আপনি পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সামনে প্রশ্ন রাখুন তাদের মাঝে দাম্পত্য কলহের হার কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

(গ) অল্পবয়সী মেয়েরা বয়সী মেয়েদের তুলনায় তাদের স্বামী এবং শ্বশুর পরিবারের অধিক অনুগত হয়ে থাকে। কারণ বয়সী মেয়েরা তাদের মনমতো পারিবারিক জীবন যাপনে বেশি আগ্রহ বোধ করে থাকে। (আবূ হুসাম তারফাবী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ ১/৫০-৫১)

**বিশিষ্টদের বাল্যবিবাহ**

বাল্যবিবাহ নিয়ে মূলধারার মিডিয়াগুলো অবিরাম ঘাম ঝরিয়ে চলছে। বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে তারা সাধ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। অথচ তাদের বরণীয় যারা তারাই বাল্যবিবাহকে সমাদর আয়োজনে বরণ করে নিয়েছিলেন। আমরা নিম্নে মূলধারার (?) রাজনীতিক, আইনবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিকট সমাদৃত ও বরণীয় কিছু ব্যক্তিদের নাম তুলে ধরবো যারা বাল্যবিবাহে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং শিশুপরিণয়ের তারা ঘোর সমর্থক ছিলেন।

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক. যশোরের দক্ষিণ ডিহি গ্রামের শুকদেব রায় চৌধুরীর বংশের ঠাকুর এস্টেটের গোমস্তা বেনীমাধবের কন্যা ভবতারিনী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর এবং ভবতারিনী দেবীর বয়স ছিল ১০/১১ বছর। সুতরাং বর বাদ দিলেও কনের বয়সের বিবেচনায় এ বিয়ে ছিল সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহ। মৃণালিনী দেবী মারা যান ১৯০২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে। তার বয়স হয়েছিল তখন মাত্র ঊনত্রিশ বছর। প্রায় ঊনিশ বছর বয়সে পাঁচ সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি।

খ. ১. কবির প্রথম কন্যা মাধবীলতা বেলা। বয়স তের পেরিয়ে কেবলই চৌদ্দতে পা দিয়েছে। কবি তখন তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত পাত্রের সন্ধান পেয়ে মেয়েকে বাল্য বয়সেই পাত্রস্থ করেন। বিয়ের সময় বেলার বয়স ছিল ১৪ বছর এবং জামাতা শরৎ চক্রবর্তীর বয়স ছিল ঊনত্রিশ বছর। স্বামীর সাথে বেলার বয়সের ব্যবধান ছিল ১৫ বছর।

২. কবির সেজো মেয়ে রেনুকা, ডাক নাম রানী। রানী কেবল এগারোতে পা দিয়েছে। কবি তাঁকে এ বয়সেই বিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন।

৩. রবীন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা মীরা (১৮৯৪-১৯৬৯), ডাক নাম অতসী। কবি তার ছোট্ট এ মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। যখন বিয়ে সম্পন্ন হয় মীরার বয়স তখন ১৩ বছর।

(২) রবি ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বিয়ে করেছিলেন ১৪/১৫ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রী সারদা দেবীর বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর।

(৩) শিবনাথ শাস্ত্রী বিয়ে করেছিলেন ১২/১৩ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১০ বছর।

(৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিয়ে করেছিলেন ১৪ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল ৮ বছর।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন ১১ বছর বয়সে তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর।

(৬) রাজনারায়ণ বসু বিয়ে করেছিলেন ১৭ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১১ বছর।

(৭) জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ১৯ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।

(৮) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ১৭ বছর বয়সে। তখন তার স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। (সূত্র : http://www.dailysangram.com/post/278817)

(৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তার বয়স হয়েছিলো ১৮ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স হয়েছিল মাত্র ৮ বছর। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি বেশ আয়েশী উপস্থাপনায় তার বিবাহ বয়স নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বারো তেরো হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।' রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান; পৃষ্ঠা ৬-৮) - http://www.sonelablog.com

**বৈবাহিক বয়স : প্রেক্ষিত ইউরোপ আমেরিকা ও বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন**

১. স্পেনের ক্যাথলিক গির্জা থেকে বিবাহের বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিবাহ চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বরের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৪ এবং কনের বয়স ১২ হতে হবে। তেমনিভাবে আমেরিকার অ্যারিজোনা, ফ্লোরিডা, আইডাহো রাজ্যের বিবাহ আইনেও বলা হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে বরের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৪ এবং কনের বয়স ১২ হতে হবে।

২. আমেরিকার কলোরাডো রাজ্যের বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, বিবাহের ক্ষেত্রে বরের ২১ কনের ১২ বছর পূর্ণ হতে হবে।

৩. যুগোস্লাভিয়ার বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, ছেলের ১৫ এবং মেয়ের ১৩ বছর পূর্ণ হতে হবে।

৪. আমেরিকার আলাবামা রাজ্যের বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, ছেলের ১৭ বছর এবং মেয়ের ১৩ বছর পূর্ণ হতে হবে।

৫. ইতালির বিবাহ আইনে বলা হয়েছে, ছেলের ১৬ এবং মেয়ের ১৪ বছর পূর্ণ হতে হবে।

৬. গ্রিসের বিবাহ আইনে ১৮ এবং ১৪ বছর শর্ত করা হয়েছে।

৭. ইউরোপের বেলজিক রাজ্যের বিবাহ আইনে যথাক্রমে ১৮ এবং ১৫ বছরে শর্ত করা হয়েছে।

৮. জাপানের বিবাহ আইনে ১৭ এবং ১৫ বছর করা হয়েছে।

৯. নেদারল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে ১৮ এবং ১৬ বছর করা হয়েছে।

১০. ইয়াহুদী ধর্মে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ১৮ এবং মেয়ের বয়স ১৩ করার বিধান রাখা হয়েছে। (আলা আবূ বাকার কৃত ইনসানিয়াতুল মারআতি বাইনাল ইসলামি ওয়াল আদইয়ানিল উখরা এর সৌজন্যে আবূ হুসাম তারফাবী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ ১/৫২)

১১. অন্যদিকে বাংলার হিন্দু পরিবারগুলোর মাঝে প্রাচীনকাল থেকেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের, বাল্যকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই বিবাহ দেয়াকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। প্রচীন হিন্দু আইনপ্রণেতা মনু নারীর বিয়ের বয়সের যে বিধান দিয়েছেন, তা হলো ত্রিশ বছরের পুরুষ বারো বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে। চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে, নইলে ধর্ম লজ্জিত হয়। (বাংলাপিডিয়া ৯/৩৩৯)

আরবের দৈনিক আঞ্চলিক পত্রিকা আল-হায়াতে রোচেস্টার/রোচেসরাজ ভার্সিটির নারী গবেষণা কেন্দ্রের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে আমেরিকায় বিবাহের হার আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো,

(১) আমেরিকানরা বিবাহ বয়সকে অধিক বিলম্বিত করে চলেছে। ১৯৬০ সালে নারীর বিবাহের গড় বয়স ছিল বিশ বছর। আর পুরুষের বিবাহের গড় বয়স ছিল ২৩ বছর। ১৯৯৭ সনে গিয়ে বিবাহ বয়সের গড় গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫-২৭ বছরে।

(২) মানুষের বিবাহের বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে বিবাহের প্রতি মানুষের আগ্রহ তত হ্রাস পেতে থাকে। ফলে অনেক আমেরিকান মেয়ে বৈবাহিক সূত্রবিহীন সন্তান প্রসব করে থাকে। ষাটের দশকে আমেরিকাতে ২৫.৩ পার্সেন্ট শিশু বৈবাহিক সূত্রবিহীন জন্ম লাভ করে। ১৯৯৭ সনে গিয়ে বিবাহসূত্র-বিহীন শিশুর হার দাঁড়ায় ৩৫ পার্সেন্ট।

(৩) বিবাহ বয়স বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবন এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ফলে দেখা যাচ্ছে একছাদের নিচে একজন পুরুষ এবং মহিলা বিবাহবিহীন যৌনজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। (ড. হুসামুদ্দীন আফফানা, আয্যিওয়াজুল মুবকির ১/৬)

**বাল্যবিবাহ বনাম বাল্যব্যভিচার**

বিবাহে সমস্যা। ব্যভিচারে সমস্যা নেই। সামাজিক দৃষ্টিতে বিষয়টা ঘৃণিত ও আপত্তিকর মনে হলেও আইনের দৃষ্টিতে বিষয়টা সামান্যতমও ঘৃণার নয়; পুরোটাই বিধিসম্মত।

**ভূতাশ্রিত সরিষা দ্বারা ভূত তাড়ানো হাস্যকর বৈ কিছুই নয়**

সম্প্রতি আলজাজিরা পরিবেশিত একটি সংবাদ বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। যে আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী বাল্যবিবাহ বন্ধে আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছে সে আমেরিকাই বাল্যবিবাহ জ্বরে কঠিনভাবে আক্রান্ত। শিশু অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ক সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আমেরিকার মাটিতেই বিদ্যমান। শিশু অধিকারে অন্যতম একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রকল্প। অথচ সে আমেরিকার অধিকাংশ রাজ্যে এখনো বাল্যবিবাহ অনুমোদিত। ২৫টি রাজ্যে অল্পবয়সী মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স পর্যন্ত নির্ধারিত নেই। অন্যদিকে অবশিষ্ট রাজ্যগুলোতে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৩ রাখা হয়েছে। আমেরিকার শিশুবিয়ে বন্ধে আন্দোলনকারী সর্বশেষে মুক্ত নামক একটি মুভমেন্টের সর্বশেষ তথ্যমতে ২০০০ সাল থেকে নিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৭ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের সংখ্যা দুই লক্ষেরও বেশি। পাশাপাশি আলাস্কা, লুইজিয়ানা ও উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যে ১২ বছর বয়সী মেয়েদের এঙ্গেজমেন্ট হয়। গত ১০ বছরে আমেরিকায় ১২ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ফারিদি রিসেল নেতৃত্বাধীন সংগঠনটি আরো জানায়, অধিকাংশ বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের মাঝেই সংঘটিত হয়। হিউম্যান রাইট ওয়াচ জানায়, ২০০০ হতে ২০১০ সালের মধ্যে ফ্লোরিডা রাজ্যে ১৬৪০০ এর বেশি বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। আর শুধু নিউইয়র্কেই ১৮ বছরের নিচে ৩৮৫০ জনের বেশি শিশুর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আরবের বৃদ্ধ শাইখদের অসম (?) বিবাহের সংবাদ মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করলেও মার্কিনিদের এসব ‘কিত্তি-কলাপ’ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই বললেই চলে। দ্বিচারী এ মনোভাব বিশ্বসভ্যতায় মানবাধিকার রফতানীকারী শক্তিশালী একটি দেশের স্পষ্ট নৈতিক দেউলিয়াত্বেরই পরিচয় বহন করে। (ourislam24.com)

**নারী পুরুষের যৌনজীবন একপ্রকৃতির নয়**

গড়পরতা মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। একজন নারী তার যৌনজীবনে প্রায় চারশ’র মতো ডিম্বকোষ উৎপাদন করতে পারে। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা মেয়েদের মত এতোটা সীমিত নয়। বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষের শুক্রকীট উৎপাদনক্ষমতা সচল থাকে। মেয়েদের জীবনে পুরুষের তুলনায় বার্ধক্য আসে অতি দ্রুত। তাই বৃদ্ধা নারীর গড়পরতা বৃদ্ধি সব দেশেই বেশি দেখা যায়। পৃথিবীতে বৃদ্ধ পুরুষের তুলনায় বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশি। মানসিক দিক থেকেও নর-নারীর বিকাশ-বৃদ্ধি একরকম নয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কথা বলতে শেখে আগে। তারা সংসার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হয়ে উঠে ছেলেদের আগে। তাই ছেলে-মেয়ের মানসিক ও জৈবিক বয়সকে একাকার করে দেখতে চাওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়। ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিবাহ বয়স নির্ধারণ করতে হলে মানব জীবনের এসব জৈব বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। মেয়েদের বিবাহ বয়স বৃদ্ধি করে তাদের আইবুড়ি করা হবে তাদের জন্য চরম ক্ষতিকর। অধিক বয়সী মেয়েরা সন্তান ধারণে পেইন সমস্যায় ভোগেন বেশি। অনেক ক্ষেত্রে তাদের গর্ভজাত সন্তান হয় হাবাগোবা। কারণ তাদের জরায়ুতে ভ্রূণের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। এ বয়সে ভ্রূণের মাথার উপর জরায়ু প্রাচীরের চাপ পড়ে। ফলে বেশি বয়সী নারীর সন্তান হাবাগোবা হবার আশঙ্কা খুব বেশি। ইংরেজিতে এরকম হাবাগোবা সন্তানকে বলা হয় মঙ্গোলিয়ান ফিব্ল মাইন্ডেড। উপরন্তু বেশি বয়সের মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। ফলে বেশি বয়সী মেয়েদের বিবাহে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেশি। সুতরাং বিবাহ-বয়স নিরূপণের ক্ষেত্রে এসব বাস্তবতাকেও বিবেচনায় নেয়া কর্তব্য।

(http://www.onnodiganta.net/article/detail/4906)

**ব্যাকডেটেড কে বা কারা?**

বাংলাদেশে এখন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন শিরোনামে যে আইনটি চলছে তা মূলত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন -১৯২৯ হতে উদ্গত। সেকালে এ আইনটিকে এ নামে ডাকা হতো না। ডাকা হতো সারদা আইন নামে। আইনটি তৈরী করেছিলো হরবিলাস সারদা নামক এক ব্যক্তি, যাকে ব্রিটিশরা অতিশয় আনুগত্য প্রদর্শনের দরুণ দেয়ান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। হরবিলাস সারদা ছিলো হিন্দু হিতৈষী। হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সে একটি গ্রন্থও রচনা করে। বস্তুতঃ সে সময় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার অন্যতম কারণ যৌতুক প্রথা। সেকালে অনেক হিন্দু বাবা-মা আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ মেয়ের যৌতুক যোগাড় করতে সক্ষম হতো না। ফলে মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তাকে আইবুড়ি ডাকা হতো এবং বিবাহ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়তো। কারণ হিন্দুদের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানত মনুর বিধান অনুসারে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, মেয়েদের আট বছর বয়সের মধ্যেই বিবাহ প্রদান করতে হবে। হিন্দু সমাজে আট বছর বয়সী বালিকাকে বলা হয় গৌরী। গৌরী অর্থ অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। গৌরীদান মানে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান। তখন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিলো ১৪ বছর। এতে করে হিন্দু বাবা-মায়েরা অন্তত যৌতুক প্রস্তুত করার জন্য কিছুটা সময় পেতো। হরবিলাস সারদা ১৯২৭ সালে বাল্যবিবাহ বিষয়ে যে আইনটি তৈরি করেছিলো তা ছিলো মূলত হিন্দু বাল্যবিবাহ আইন। পরবর্তীকালে সুকৌশলে হিন্দু, মুসলিম সকলের উপর এ আইনটি চাপিয়ে দেয়া হয়। যা হোক, সে সময় সারদা আইনের অন্যতম বেইজ ধরা হয় Age of Consent বা যৌনসম্মতি বয়স তথা নারীদের বয়ঃপ্রাপ্তির সময়কে। সে সময় নারীরা সাধারণত ১৪ বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হতো। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা

গবেষণা করে দেখেছেন, সময় যতো যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা ততো দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে। কয়েক বছর আগে জার্মান বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দাবি করেছেন,

১৮৬০ সালে মেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হতো ১৬.৬ বছর বয়সে।

১৯২০ সালে তা নেমে আসে ১৪.৬ বছর বয়সে।

১৯৫০ সালে তা হয় ১৩.১ বছর বয়স।

১৯৮০ সালে তা আরো নেমে দাঁড়ায় ১২.৫ বছর বয়সে।

এবং ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১০.৫ বছর বয়সে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বাল্যবিবাহ নিরোধ বা সারদা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো নারীদের বয়ঃপ্রাপ্তি বয়সকে কেন্দ্র করে। তখন মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তি হতো ১৪ বছর বয়সে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে বর্তমানে মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স ১০ বছরে নেমে এসেছে। সে হিসেবে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি ব্যাকডেটেড বা মান্ধাতার আমলের আইন, যা বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে না। বর্তমান অনেকে এ আইনকে আধুনিকতা হিসেবে ধারণা করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে এ আইনকে যারা সঠিক মনে করে তারাই ব্যাকডেটেড এবং যারা সঠিক মনে করে না তারাই আধুনিক। (https://www.facebook.com/noyon chatterjee5)

**সাবালকত্বের সূচনা বয়সে বিবাহের ইতিবাচক দিক**

১. সূচনা বয়সী মেয়েদের প্রজননক্ষমতা অধিক বয়সী মেয়েদের সন্তান প্রজননক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি।

২. গর্ভাশয়, ডিম্বাশয় এবং স্তনের অবাঞ্ছিত স্ফীতি ঐসব মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক কম লক্ষ্য করা যায় যারা সূচনা বয়সে গর্ভ ধারণ করে এবং সন্তান প্রসব করে।

৩. জরায়ুর বাইরে গর্ভসঞ্চার (Ectopic Pregnancy-الحمل المهاجر) : আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রাবিন তার ১৯৮৩ সনের একটি গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, যেসব নারীদের বয়স ৩৫ এর উর্ধ্বে তাদের জরায়ুর বাইরে গর্ভসঞ্চারের হার ১৭.২ পার্সেন্ট। আর যেসব মেয়েদের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তাদের অকাল গর্ভসঞ্চারের হার ৪.৫ পার্সেন্ট।

৪. গর্ভচ্যুতি রোধ : আমেরিকান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হ্যাওয়েন এর গবেষণা মতে ৩৫ বছরের উর্ধ্বের নারীদের গর্ভচ্যুতির হার অল্পবয়সী নারীদের তুলনায় চার গুণ বেশি। সারকথা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা প্রমাণ করে, যেসব মেয়েদের বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে তাদের গর্ভজটিলতা তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। আর ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের যে গর্ভজটিলতা সৃষ্টি হয় তাও তুলনামূলক অনেক কম। পার্কল্যান্ড হসপিটাল টেক্সাস এর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যাটিন এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। (ড. হুসামুদ্দীন আফফানা, আয্‌যিওয়াজুল মুবকির ১/৭)

উল্লেখ্য, যে সব রাষ্ট্রে শীতের মাত্রা তুলনামূলক বেশি সে সব রাষ্ট্রে সাবালকত্বের মেয়াদ দীর্ঘ হয়। এজন্যই তারা বিবাহ বয়স ১৮ নির্ধারণ করে থাকে। তো গ্রীষ্মপ্রবণ রাষ্ট্রগুলোতে বিবাহ বয়স বৃদ্ধি করে বিশ-একুশ বছর করার কি কারণ থাকতে পারে? এখানে তো সাবালকত্বের মেয়াদ দীর্ঘ হয় না। উপরন্তু শীতপ্রধান দু'টি রাষ্ট্র সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড বিবাহস্বল্পতা এবং প্রজননস্বল্পতার কারণে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কারণ বিবাহ বয়সের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধ্যবাধকতা অবাধ এবং উন্মুক্ত যৌনাচারের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং তাদের আর বিবাহের প্রয়োজন পড়ে না। (আবূ হুসাম তারফাভী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ ১/৫৩)

**তথ্যসূত্র :**

কুরআনুল কারীম; সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; ড. হুসামুদ্দীন আফফানা, আযযিওয়াজুল মুবকির; আহকামুল কুরআন লিলজাস্‌সাস; মাকালাতুন ফিত তাশাইউ; আলমাবসূত লিস সারাখসী; নিনা অ্যাপ্টন, লাভ এ্যান্ড দ্যা ইংলিশ; আবূ হুসাম তরফাবী, আল-উনফ যিদ্দাল মারআহ; কিতাবুদ দলীল; সংসদ বাংলা অভিধান; মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, ইসলামীক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন; Child Marriage Prevention Law; বাংলাপিডিয়া; মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., জাওয়াহিরুল ফিকহ; জাস্টিস মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, হামারে আয়েলী মাসায়েল; দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ ও ইন্টারনেট।

লেখক : আমীনুত তা'লীম, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

=========================

(২৯ পৃষ্ঠার পর; ইসলামের ইতিহাস)

এর অল্প কিছুদিন পরেই ওরাকা মৃত্যুবরণ করেন। মুসান্নাফে আব্দুর রযযাকের বর্ণনায় (হাদীস-৯৭১৯) তাঁর 'জান্নাতী' হওয়ার সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি সাহাবী ছিলেন কি না? এ বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। অনেকের মতেই তিনি সাহাবী ছিলেন। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আল ইসাবা ৬/৪৭৪, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩/১০)

এ ঘটনার পর দীর্ঘ তিন বছর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকে। এ সময়টিকে 'ফাতরাতে ওহী' (ওহীর বিরতী) বলা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য, ভীতি দূর হয়ে যেন ওহীর জন্য নবীজী প্রতীক্ষমান হন। এ সময় কুরআন নাযিল না হলেও হযরত জিবরাঈল আ. এর আগমন জারী ছিলো। ফাতরাতে ওহী শেষ হয়ে এলে দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত জিবরাঈল আ. সূরা মুদ্দাসসির নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং এরপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ওহী অবতরণের ধারা চালু হয়ে যায়। সূরা আলাকের আয়াতগুলোর মাধ্যমে গারে হেরায় নবীজীকে নবুওয়াত দান করা হয় এবং 'ফাতরাতে ওহী' শেষ হওয়ার পরে সূরা মুদ্দাসসিরের মাধ্যমে নবীজীকে লোকদের মাঝে দীনের দাওয়াত প্রদান করার জন্য আদেশ দান করা হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৯২৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা আলাক, ফাতহুল বারী; হা.নং ৩, ৪, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩/১৯)

এ আদেশের পরই নবীজী দাওয়াতের নববী দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। ফলে মক্কার আকাশে শুরু হয় আলো ও আঁধারের অবশ্যম্ভাবী লড়াই! কিন্তু শত বছরের শিরক ও কুফরের গাঢ় অমানিষা ভেদ করে অবশেষে উদিত হয় একত্ববাদ ও ঈমানের প্রদীপ্ত রবি! কেননা,

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ : তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখ (-এর ফুৎকার) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। (সূরা তাওবা- ৩২)

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

# রক্তভেজা ফিলিস্তিন ও ইহুদী ষড়যন্ত্রের ক্রমধারা

মাওলানা তানভীর মুস্তফা

চলমান সময়ে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল সঙ্কট একটি বৈশ্বিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন যত সামনে বাড়ছে, এ সঙ্কট ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। বিগত ১০০ বছর ধরে নিজ ভূমিতেই পরবাসী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে ফিলিস্তিনি জনগণ। নরপিশাচ ইহুদীদের পৈশাচিক নির্যাতন আর বর্বরতা থেকে নিরাপদ নয় ফিলিস্তিনের অসহায় নারী-শিশু ও বৃদ্ধরাও। গুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধে এখানকার পরিবেশ আজ দূষিত। মযলুম মুসলমানের আর্তচিৎকার আর আহাজারিতে সদা ভারী হয়ে থাকে ফিলিস্তিনের আকাশ-বাতাস। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমবর্ধমান এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আরো ইন্ধন যোগালেন জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে। তিনি যেনো আগুনে ঘি ঢেলে দিলেন। ফলে আবারো রাস্তায় নেমেছে ফিলিস্তিনিরা। করে যাচ্ছে মাতৃভূমি আযাদ করার নিরন্তর জিহাদ। অপরদিকে দখলদার ইসরাইলীরা আরও হিংস্র হয়ে উঠছে এবং বয়ে যাচ্ছে রক্তের বন্যা। এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে অগণিত নিরীহ মানুষ। ফলে আবারো বিশ্ব দরবারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ফিলিস্তিন-ইসরাইল। ট্রাম্পের এই নীতিহীন, শঠতাপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তে ফুঁসে ওঠে মুসলিমবিশ্ব। ক্ষোভে ফেটে পড়ে মুসলিম উম্মাহ। প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার সিদ্ধান্তে অনড়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মিত্র দেশগুলো নাখোশ হলেও তিনি তার অবস্থান থেকে একচুলও নড়ছেন না। এদিকে মার্কিন ঘোষণার পরপরই ইসরাইলী প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্যারিসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে সংলাপের পর এক বক্তব্যে বলেন, 'তিন হাজার বছর ধরে জেরুসালেম ইসরাইলের রাজধানী। তা কখনোই অন্য কোনো দেশের রাজধানী ছিলো না।' ইহুদীদের সঙ্গে জেরুসালেমের এই হাজার বছরের সংযোগ অস্বীকার করাকে তিনি উদ্ভট বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রিয় পাঠক! চলুন, নেতানিয়াহুর এ বক্তব্য কতটা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা জেনে নিই।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতাব্দীতে ইহুদীরা সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর নানা উত্থান-পতন ও ঝড়ঝাপ্টার পর এ ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তারা।

অন্যথায় ইতিহাসের আদি উৎস থেকেই ইহুদী জাতির স্থায়ী কোন আবাসভূমি নেই। এ কারণেই বাইবেলের পুরাতন নিয়মে 'সৃষ্টিতত্ত্বে' ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পরিভ্রমণকারী জাতির নেতা বলা হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরবর্তী পুরুষ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তাঁর উপাধি ছিল ইসরাইল।

ইহুদী জাতি তাঁরই বংশধর এবং তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত করে ইহুদীদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয়। বাইবেলের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে ইহুদীরা ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসী নয়; বরং এ ভূখণ্ডে প্রবেশের পর এখানকার আদি অধিবাসীদের উপর ব্যাপক নিধন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদেরকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে তারা। যার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলে রয়েছে। এরপর খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আসিরিয়ানদের বাদশা উত্তর ফিলিস্তিন ভূখণ্ড অধিকার করে ইহুদীদেরকে সেখান থেকে চরমভাবে উচ্ছেদ করেন এবং আরবদেরকে অধিবাস করার সুযোগ দেন। এর ফলে ইহুদীরা দক্ষিণ ফিলিস্তিনে একেবারেই একঘরে হয়ে পড়ে। এ ঘটনার দু'শ বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবেলের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট বুখতে নাসার দক্ষিণ ফিলিস্তিনে চড়াও হয়।

সম্রাট বাইতুল মাকদিসে আক্রমণ চালিয়ে মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দেয় এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে শহরটি উজাড় করে দেয়। এরপর ইহুদীরা বাইতুল মাকদিস থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। ইরানীদের শাসনামলে ইহুদীরা পুনরায় দক্ষিণ ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং এ সুযোগে বাইতুল মাকদিসের পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু এবারো তারা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ৭০ খ্রিস্টাব্দে ইহুদীরা রোম সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে পরিণতিতে তাদেরকে বাইতুল মাকদিস তথা জেরুসালেম শহর ছাড়তে হয়।

রোম সম্রাট বাইতুল মাকদিসকে ধ্বংস করে দেয়। ১৩০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ করলে এবার পুরো ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদেরকে উৎখাত ও বিতাড়িত করা হয়। এরপর থেকে ফিলিস্তিনের এ দক্ষিণাংশেও আরবরা থাকতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মের আগমনের আগ পর্যন্ত এ গোটা অঞ্চলে আরবদেরই অধিবাস ছিলো।

রোমসম্রাট বাইতুল মাকদিসে ইহুদীদের প্রবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিলেন। ফিলিস্তিনে তখন বলতে গেলে ইহুদী বসতি একেবারেই ছিলো না।

তো এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তা এই-

১. ইহুদীরা প্রাথমিক পর্যায়ে ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসীদের উপর Genocide বা ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে ফিলিস্তিন দখল করে। সুতরাং তারা ফিলিস্তিনের মূল অধিবাসী নয়; দখলদার।

২. ফিলিস্তিনের উত্তরাংশে মাত্র চার থেকে পাঁচ'শ বছর আর দক্ষিণাংশে আট থেকে নয়'শ বছর তাদের অধিবাস বহাল থাকে।

৩. আর আরবরা উত্তর ফিলিস্তিনে প্রায় আড়াই হাজার বছর আর দক্ষিণ ফিলিস্তিনে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বসবাস করতে থাকে।

ইতিহাসের এই সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও ইহুদীরা আজ দাবী করছে, ফিলিস্তিন তাদের মৌরুসী ভূখণ্ড, যা সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে দান করেছেন। এজন্য তাদের ভাষায় তারা এ ভূখণ্ডে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ অধিকারের ভিত্তিতেই আজ অসহায় আরব ফিলিস্তিনিদের ওপর যারপরনাই দমন-পীড়ন ও যুলুম-নির্যাতন করে যাচ্ছে তারা।

দৈনিক প্রথম আলোর বিশিষ্ট কলামিস্ট ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন,

'ইহুদীরা বাইবেলের উপকথাকে তাদের সংবিধানের মৌলিক অংশ করে নিয়ে দাবি করছে, জেরুসালেম তাদের চিরন্তন রাজধানী এবং জর্ডান নদী থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা হবে ইসরাইলের ভূমি। অথচ বাইবেল কথিত 'ল্যান্ড অব ইসরাইল'ও কোনো ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝাত না, তা বোঝাত ইহুদিদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রকে। বাস্তবে তা ছিল কেনান ও জুডাহ নামের অঞ্চল। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগে ও পরে মাত্র কয়েক শ' বছর জেরুসালেমে ইহুদী রাজত্বের দাবির ভিত্তিতে এই প্রাচীন নগরীর সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মালিকানা দাবি করাও তাই অন্যায়। হযরত উমর রাযি.-এর জেরুসালেম জয়ের পরেই কেবল তারা তাদের বাইতুল মাকদিসে প্রবেশের অধিকার ফিরে পায়, যে অধিকার কেড়ে নিয়েছিল রোমানরা।

ইসরাইলে বসবাসকারী ইহুদিদের ৯০ শতাংশও নৃতাত্ত্বিকভাবে আদি বনি ইসরাইল বা হযরত ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসহাকের বংশধর নয়, বরং তাঁদের রক্তে বইছে মধ্যযুগীয় পূর্ব ইউরোপীয় খাজারি রাজত্বের অধিবাসীদের রক্ত, পনেরো শতকে মোঙ্গল আক্রমণে যারা মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি তারা হিব্রুভাষায়ও কথা বলত না। তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শ্লোমো স্যান্ডের বেস্ট সেলার বই 'দ্য ইনভেনশন অব জুয়িশ পিপল' এবং 'দ্য ইনভেনশন অব দ্য ল্যান্ড অব ইসরাইল' ইসরাইলের যাবতীয় দাবিকে অথই পানিতে ফেলে দিয়েছে।

ড. শ্লোমো স্যান্ড দাবি করেছিলেন, আজকের ফিলিস্তিনিদের মধ্যেই আদি বনি ইসরাইলের বংশধরদের রক্ত বেশি প্রবাহিত। ইতিহাসের পরিহাস এই যে ইহুদিবাদী বানোয়াট রাষ্ট্র ইসরাইল ইহুদিদের নামে তাদের ধর্মীয়, জাতিগত ও ভূমিগত জ্ঞাতিভাই-বোনদের হত্যা করে চলেছে। ইসরাইলকে মোকাবিলা করতে হলে তার নকল ইতিহাস ও রাষ্ট্রপ্রকল্পের অসারতাও দেখাতে হবে।'

যাইহোক ইহুদীরা বিগত দু'হাজার বছর ধরে এ স্বপ্ন দেখে আসছে যে, বাইতুল মাকদিস পুনরায় তাদের হাতে ফিরে আসবে এবং তারা এর পুনঃনির্মাণ করবে। এখনো ইহুদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে তাদের দীর্ঘ লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ইতিহাস অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে পাঠ করা হয়। মিশর থেকে বিতাড়ন, ফিলিস্তিনে অধিবাস গ্রহণ, সম্রাট বুখতে নাসার কর্তৃক নির্দয়তম অত্যাচার ভোগ এবং পুনরায় ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কৃতি ইত্যাদি দীর্ঘ উপাখ্যান নতুন প্রজন্মকে শোনানো হয়। এভাবে দীর্ঘ বিশ শতাব্দি ধরে প্রতিটি ইহুদী শিশুর মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হচ্ছে যে, ফিলিস্তিন তোমাদের পৈত্রিক ভূখণ্ড। যে করেই হোক এ ভূখণ্ড তোমাদের অধিকারে আনতে হবে। তোমাদের জীবনের একটি পরম লক্ষ্য হওয়া চাই, বাইতুল মাকদিসকে পুনরুদ্ধার করে এর পুনঃনির্মাণ করা। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইহুদীরা স্বপ্ন দেখে আসছে ইসরাইল নামের একটি রাষ্ট্রের। 'নেক্সট ইয়ার ইন জেরুসালেম' এই শ্লোগান মাথায় নিয়ে বহু ইহুদী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। গত শতাব্দীতে ইহুদী নেতৃত্বে Freemason Movement বা ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের নামে যে উত্তাল জোয়ার শুরু হয়েছিল এর পেছনে এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কাজ করেছে। কোনক্রমে এই পবিত্র স্থানের দখল ইহুদীদের হাতে চলে আসলে তারা এর স্থলে তাদের উপাসনালয় তথা সলোমন মন্দির বা Sznagogue নির্মাণ করবে।

**ইহুদীদের অকৃতজ্ঞতার একটি চিত্র**

এখানে একটি বিষয় পাঠকবর্গকে না জানালেই নয়; তা হল, ইহুদীদের ধর্মীয় উপাসনালয় তথা সলোমন মন্দির বা Sznagogue এর ব্যাপারে একথা ইতিহাসসিদ্ধ যে, ৭০ খ্রিস্টাব্দে ইহুদীরা বিদ্রোহ করলে রোম সম্রাট এর অস্তিত্বকে একেবারেই বিলীন করে দেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাযি.-এর শাসনামলে যখন জেরুসালেম বিজিত হয় তখন এখানে ইহুদীদের কোনো উপাসনালয় ছিলো না। সুতরাং মসজিদে আকসা ও কুব্বাতুস সাখরার নির্মাণের ব্যাপারে কোনো ইহুদীর একথা বলার অধিকার নেই যে, মুসলমানরা তাদের উপাসনালয় ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছে। একথাও ইতিহাসে প্রমাণিত যে, রোমান শাসনামলে পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ইহুদীশূন্য ছিলো এবং বাইতুল মাকদিসে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিলো। মুসলমানদের মহানুভবতা ও অনুগ্রহ ছিলো, যখন তারা ইহুদীদেরকে পুনরায় এ ভূখণ্ডে থাকার সুযোগ দিয়েছে। বিগত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস সাক্ষী, ইহুদীদের কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করার সুযোগ হয়ে থাকলে তা কেবল মুসলিম রাষ্ট্রেই হয়েছে। খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অধিকার হরণ ও বৈষম্যের শিকার হওয়া ছাড়া আর কিছুই তাদের অর্জিত হয়নি। ইউরোপে তখন ইহুদীদেরকে গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ে রাখার মত করে ঘেঁটো বানিয়ে বসবাস করানো হতো। ইহুদী ঐতিহাসিকরাও একথা স্বীকার করে যে, ইহুদীদের সোনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা স্পেনে মুসলমানদের প্রজা হিসেবে ছিল। আজ West wall বা পশ্চিম দেয়াল–যাকে ইহুদীরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত পবিত্র স্মৃতি বলে বিশ্বাস করে–তা-ও মুসলমানদের অবদানেই তাদের অর্জিত হয়েছে। কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদী জাতি, অকৃতজ্ঞতা যাদের অস্থিমজ্জায় প্রোথিত, মুসলমানদের এই মহানুভবতা ও অনুগ্রহের বদলা তারা আজ খোদ মুসলমানের রক্ত নিয়েই দিচ্ছে।

**ইহুদী চক্রান্তের সূচনা**

রোমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ইহুদীরা ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্বাসিত জীবনযাপন শুরু করে। নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তির জন্য ইহুদী সমাজে নানা ধরণের আন্দোলনের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইহুদীদের দুষ্কৃতি ও অকৃতজ্ঞতাসুলভ চরিত্রের কারণে ইউরোপে Anti-semitism তথা ইহুদী-বিদ্বেষ দানা বাঁধতে শুরু করলে এ সময় ইহুদীরা নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে। তাদের মতে তাওরাতের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ফিলিস্তিনেই সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। তবে তাওরাতে কোথাও বলা নেই যে, ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইহুদীদের জন্য আবশ্যক। প্রায় সহস্র বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতিত হলেও মানুষ নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, Anti-semitism এর উত্থানের যুগে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কোন অধিকারই ছিল না। তো ধূর্ত ইহুদীসমাজ তাদের এ টার্গেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনে অধিবাস গ্রহণ ও ভূমি ক্রয় শুরু করে। ১৮৮০ সনে তাদের এ অভিবাসন নীতির সূচনা হয়। প্রথমদিকে পূর্ব ইউরোপ থেকে অধিকহারে ইহুদী পরিবার ফিলিস্তিনে পাড়ি জমাতে শুরু করে। ১৮৯৭ সালে প্রসিদ্ধ ইহুদী নেতা

থিওডোর হার্জেল-এর নেতৃত্বে Zionist Movement বা ইহুদী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে দখল করে তাতে ইহুদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে ১৯০১ সলে Zionist আন্দোলনের নেতা থিওডোর হার্জেল তুর্কি সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে, ইহুদীরা তুরস্কের যাবতীয় ঋণ শোধ করে দিতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হলো, ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি ঘোষণা করতে হবে। সুলতান আব্দুল হামিদ খান তাদের এ অন্যায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আর তুর্কি সালতানাত বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এই প্রত্যাশা কিছুতেই বাস্তবায়িত হবে না। তোমাদের সম্পদের উপর আমি থুথু নিক্ষেপ করছি'। হাখাম সোফেন্দী নামী এক ইহুদীর হাতে হার্জেল সুলতানের দরবারে এ প্রস্তাব পেশ করে, যার পরিবারকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করা হলে তুরস্কে অধিবাসের সুযোগ দেয়া হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তুরস্কের একজন সাধারণ প্রজা হয়ে স্বয়ং খলিফার দরবারে এ অন্যায় প্রস্তাব পেশ করার দুঃসাহস সে প্রদর্শন করে। এখানেই ক্ষান্ত নয়, হার্জেলের কাছে সুলতানের এ কড়া জবাব পৌঁছলে সে সুলতানকে এই বলে হুশিয়ার করে দেয় যে, এর অশুভ পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে। সুতরাং এ ঘটনার পর থেকেই সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল শুরু হয়।

এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে কলকাঠি নাড়ে ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের কর্ণধার আর পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী মুসলিম যুবকরা। শুরু হয় তুর্কি তরুণ-বিপ্লব। তারা তুরস্কে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে। সেনাবাহিনীতেও নিজেদের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় তারা। সাত বছরের মাথায় এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতার মসনদ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। এর চেয়েও বড় মর্মান্তিক ঘটনা ছিল, ১৯০৮ সালে যে তিন ব্যক্তি সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে তার ক্ষমতাচ্যুতির পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিল, তার মধ্যে দু'জন ছিল তুর্কি মুসলমান। আর তৃতীয়জন ছিল সেই হাখাম সোফেন্দী, যার হাতে ইহুদী নেতা হার্জেল ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাবপত্র পাঠিয়েছিল। বলতে হবে যে, এটা ছিল মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধহীনতার চূড়ান্ত প্রদর্শন। প্রিয় পাঠক! একটু আন্দাজ করুন, সুলতানের মন কতটা ভেঙে পড়েছিল এবং তাকে কতটা অসহায়ত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যখন একজন ইহুদী তার হাতে তারই ক্ষমতাচ্যুতির পরোয়ানা উঠিয়ে দিয়েছিল, যে কিনা দু'দিন আগেও সুলতানের দয়ার ভিখারী ছিল।

**আরব জাতীয়তাবাদের নেপথ্যে কি ছিল?**

সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতি ইহুদী ষড়যন্ত্রের ক্রমধারার একটি ধাপ ছিল মাত্র। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, মুসলিম জাহানের সর্বশেষ ভরসাস্থল উসমানী সালতানাতকে টুকরো টুকরো করে দেয়া। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে পশ্চিমা রাজনীতিকদের সাথে সাথে ইহুদী-মস্তিষ্ক শুরু থেকেই কাজ করছিল। একদিকে তাদের ষড়যন্ত্রে তুরস্কে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শুরু হয়; দাবী ওঠে, তুর্কি সালতানাতের ভিত্তি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের স্থলে তুর্কি জাতীয়তাবাদের উপর করা হোক। এদিকে তুর্কি সালতানাতের অধীনে তুর্কিরা ছাড়াও আরব, কুর্দি ও অন্যান্য বংশীয় মুসলমানরাও ছিল। এমতাবস্থায় এ দাবী মেনে নেয়ার একমাত্র অর্থ ছিল, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে সমবেদনা ও সহমর্মিতার যে অটুট বন্ধন ছিল, তা একেবারেই ছিন্ন করে দেয়া।

অন্যদিকে আরবদের মাঝে আরব জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে তুর্কিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। তাদের মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করা হয় যে, তুর্কিদের গোলামীর শিকল থেকে বেরিয়ে আমাদেরকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। জাতীয়তাবাদের এই চেতনাকে আরবদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পেছনে সবচে' বেশি অবদান ছিল খ্রিস্টান আরবদের। লেবাননের রাজধানী বৈরুত ছিল তাদের হেড কোয়ার্টার। এখানকার আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো এই চেতনার নেতৃত্বের জন্য মাথা তৈরীর কাজ আঞ্জাম দেয়। এভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি সালতানাতের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে নামায় ব্রিটিশ সরকার। তুর্কি ও আরবদের মাঝে দ্বিজাতি চেতনা এতটা গভীরভাবে প্রোথিত করে দেয়া হয়, যার ফলে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ও আরব একে অপরের মিত্রশক্তি হওয়ার পরিবর্তে রক্তপিপাসু শত্রুতে পরিণত হয়।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও 'বেলফোর' ঘোষণা**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ইহুদীরা জার্মানির সাথে আঁতাত করে তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে চেয়েছিল। জার্মানিতে ইহুদীদের ততটা প্রভাব ছিল যতটা আজ আমেরিকায়। তারা Kaiser wilheim থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টা করে, যুদ্ধে জয়ী হলে জার্মানী ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের স্থায়ী আবাস ভূমি ঘোষণা করবে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি সালতানাত জার্মানির মিত্রশক্তি থাকায় জার্মান সরকারের ওপর পুরো আস্থা রাখতে পারেনি ইহুদীরা। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, জার্মানী তাদের এই প্রতিশ্রুতি আদৌ রক্ষা করতে পারবে। তাই ইহুদী বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়াইজম্যান সামনে বাড়েন। তিনি ইংল্যান্ড সরকারকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন যে, এ যুদ্ধে ইহুদী জনবল ও ধনবল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে আসতে পারে। তবে শর্ত হলো, ইংল্যান্ড সরকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে, যুদ্ধে জয়ী হলে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি ঘোষণা করতে হবে। ইংল্যান্ড সরকার সন্তুষ্টচিত্তে এ প্রস্তাব মেনে নেয়। পরিশেষে ডক্টর ওয়াইজম্যানের অবদানে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ইহুদীরা ইংরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোরের পক্ষ থেকে একটি ফরমান লাভ করে, যা ইতিহাসে Balfour declaration বা 'বেলফোর ঘোষণা' হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি ছিল মুসলিম বিশ্বের সাথে ইংরেজদের চরম গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা, যা মুসলমানরা তখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজরা একদিকে আরবদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে তুর্কি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামায়। অপরদিকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদীদেরও গোপনে আশ্বাস প্রদান করে। গাদ্দারির এই কালো দাগ ইতিহাস থেকে ইংরেজরা কখনো মুছে ফেলতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক! এখানে ভাববার বিষয় হলো, ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমির জন্য নির্বাচিত করা হলো কেন। ফিলিস্তিন তো কোন পতিত ভূমি ছিল না, যেখানে নতুন কোন জাতিকে অধিবাস গ্রহণের সুযোগ দিয়ে এ অঞ্চলকে আবাদযোগ্য করা তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে। এখানে তো দুই আড়াই হাজার বছর ধরে একটি জাতি

বসবাস করে আসছিল। বেলফোর ঘোষণার সময় ফিলিস্তিনে ইহুদী জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৫ শতাংশও ছিল না। হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসা একটি জাতির স্বাধীন ভূমিতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভিশপ্ত একটি জাতির আবাসভূমি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে, এই ভূমিতে জায়গা করে দিয়ে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম। এখন আরবদেরকে উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা তোমরাই করে নাও। লর্ড বেলফোর এ সম্পর্কে তার ডায়রীতে লিখেন, 'ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেখানকার অধিবাসীদের মতামত গ্রহণে আমরা দায়বদ্ধ নই। এখানকার স্থায়ী সাত লাখ আরবের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোতুষ্টির চেয়ে ইহুদী মতামতকে প্রাধান্য দেয়াই আমরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।' Document of british policy এর দ্বিতীয় খণ্ডে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোরের লেখা এ বাক্যগুলো আজও বিদ্যমান আছে। ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইংরেজ কর্তৃত্ব ও বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদীদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রথম ধাপ পূর্ণতা লাভ করে। যা বাস্তবায়নে ১৮৮০ থেকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর সময় ব্যয় হয়। বেলফোর ঘোষণার পর একদিকে ব্রিটিশরা ইহুদীদের জন্য খুলে দেয় ফিলিস্তিনের দরজা। অন্যদিকে ব্রিটিশ বাহিনীর সহযোগিতায় ইহুদীরা আরব ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি ইহুদীরা কয়েকটি গুপ্তঘাতক দল তৈরি করে, যাদের প্রধান কাজ ছিল মেরে কেটে জোর-যুলুম করে ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের বসতভিটা থেকে উৎখাত করা। অতঃপর ১৯৩৩ সালে এডলফ হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় এলে গণহারে (?) ইহুদী নিধন শুরু করে। হিটলারের এ নিধনযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় ফিলিস্তিনে আসতে থাকে। এ সময় ইহুদী মিডিয়াগুলো হিটলারের ইহুদী নিধন কাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাস্তবের চেয়ে অন্তত পঞ্চাশগুণ বর্ধিত করে সারা দুনিয়ায় প্রচার করে। ইহুদীদের দুখিয়ারি নিয়ে শত শত গল্প-উপন্যাস রচনা করে সারা দুনিয়ায় রটিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল অসহায় ইহুদীদের ফিলিস্তিনে পুনর্বাসিত করার পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা এবং তা হয়েছেও। ফলে এ সময়টিতেই ফিলিস্তিনে ইহুদী তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। গোটা বিশ্বের ইহুদী-খ্রিস্টান ধনকুবের ও পুঁজিপতিরা ফিলিস্তিনে অধিবাসগ্রহণকারী শত শত ইহুদী পরিবারকে জমি ক্রয় ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য কোটি কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অবাক করার বিষয় হল, যে হিটলার এবং যে জার্মানী ইহুদীদের ওপর এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালাল সেই জার্মানির সঙ্গে তো ইহুদীদের কিয়ামত তক্ শত্রুতা পোষণ করার দরকার ছিল। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, ইসরাইলের এখন জার্মানী ও জার্মান জাতির সঙ্গেই বেশি সখ্যতা। ব্যাপারটি কি ইহুদী নিধন প্রচারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না?!

অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের নামে আবারও ফিলিস্তিনে ইহুদী অনুপ্রবেশের ঢল নামে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এক লাখ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে পুনর্বাসনের মত দেয়। এ সুযোগে এক লাখের স্থানে ছয় লাখ ইহুদী ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশ করে।

যাইহোক বেলফোর ঘোষণার ৩১ বছর পর আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে ইহুদী নেতা ডেভিড বেনগুরিয়ান একতরফাভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১০ মিনিটের ভেতর স্বীকৃতি প্রদান করে আমেরিকা ও ফ্রান্স। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করা নিয়ে বিতর্কিত প্রস্তাব ১৮১ গ্রহণ করে। প্রস্তাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হয়েও ইহুদীরা পেল ভূমির ৫৭ শতাংশ। আর ফিলিস্তিনিরা পেল ৪৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রটির উত্তর-পশ্চিম সীমানা ছিল অনির্ধারিত, যাতে ভবিষ্যতে আরো সীমানা বাড়াতে পারে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে চলেছে ইসরাইল, যা এখনো পূর্ণমাত্রায় বহাল আছে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব অধ্যুষিত ভূখণ্ডে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি আরব নেতারা। তাই এ ঘোষণায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরবদের সাথে ফিলিস্তিন ও তার বাইরে চারটি ব্যাপক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তাতে পাশ্চাত্য সমর্থনে বলিয়ান ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের কাছে আরবরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচে' বেশি।

বিশ্ব রাজনীতির কূটকৌশলে বিজয়ী হয়ে ইহুদীরা হত্যা ও সন্ত্রাসের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তাদের বাড়ি-ঘরে গ্রেনেড নিক্ষেপ, জমি দখল ও নির্যাতন করে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ফলে লাখ লাখ আরব বাধ্য হয় দেশ ত্যাগ করতে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুনে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পর্যন্ত মাত্র ১৯ বছরে বাইতুল মাকদিস, সাইনা উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ফিলিস্তিনের গোটা অঞ্চল দখল করে নেয় ইসরাইল। ১৯৪৮ এর নভেম্বরে ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তন ছিল মাত্র ৭,৯৯৩ বর্গমাইল। যা ১৯ বছরে ১৯৬৭ এর জুন পর্যন্ত ২৭০০০ বর্গমাইলে গিয়ে পৌঁছে। সাথে সাথে ১৫ লাখেরও বেশি আরবকে ইহুদীদের গোলামীর জীবন বরণ করতে হয়। অভিবাসী হয় বহু আরব।

**ইহুদী ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য**

ইহুদীদের এই সুচারু ও সুদীর্ঘ দুরভিসন্ধি –যার জন্য তারা দু'হাজার বছর ধরে যারপরনাই চেষ্টা-তদবির করে আসছে এবং ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কল্পনা ও পরিকল্পনা করে যাচ্ছে– তার প্রধানতম লক্ষ্য হলো দু'টি–

প্রথমত : মসজিদে আকসা ও আল কুব্বাতুস সাখরাকে ভেঙ্গে তার স্থলে Sznagogue বা সলোমন মন্দির নির্মাণ করা। এর নির্মাণের জন্য এই স্থানকেই তারা পবিত্রতম বলে গণ্য করে।

দ্বিতীয়ত : গোটা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ফিলিস্তিন তাদের মৌরূসী ভূখণ্ড বলে এটাকে তারা ধর্মীয় দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করে।

বাইতুল মাকদিসের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তারা প্রথম লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে বহু আগেই। কিন্তু দুই কারণে এখনো তারা পিছিয়ে আছে।

এক. এর ফলে ইসরাইলও তার দোসর আমেরিকার বিপক্ষে গোটা মুসলিম বিশ্ব ফুঁসে ওঠার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যা যে কোনো নেতিবাচক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

দুই. এ নিয়ে খোদ ইহুদীদের মাঝেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তর বিরোধ ও মতানৈক্য রয়েছে। **(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

# আখেরী নবীর আগমন : মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
মানুষের হিদায়াত এবং সরলপথপ্রাপ্তির জন্য হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে যুগে যুগে আম্বিয়া আ.-এর যে পবিত্র ধারার সূচনা মহান আল্লাহ পাক করেছিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সে ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো। আখেরী নবীর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ দিক হলো, আগমনের ধারায় তিনি সর্বশেষ হলেও রূহের জগতে ফেরেশতাদের পরিবেশে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি নবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় (হাদীস নং ১৭১৫০) এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته،دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسىبي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين

অর্থ : নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, সর্বশেষ নবী, যখন আদম মাটি ছিলেন। (আমি) আমার পিতা ইবরাহীম'র দু'আ, ঈসা'র সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। নবীগণের মায়েরা এভাবেই (সন্তানের নবী হওয়ার বিষয়টি) স্বপ্নে দেখে থাকেন।

মহান আল্লাহ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটাই সম্মান দিয়েছিলেন যে, রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে, তাদের যামানায় যদি আখেরী নবীর আগমন ঘটে, তবে তারা যেন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং নিজ নিজ উম্মতকে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ইরশাদ করেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থ : আর যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি এ কথা স্বীকার করছো এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছো? তারা বলেছিলো, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম। (সূরা আলে ইমরান- ৮১)

আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনার্থে সকল নবীই নিজ নিজ উম্মতকে আখেরী নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। যার ফলে আসমানী কিতাব তাওরাত এবং ইনজিলে– যা নাযিল হয়েছিলো ইহুদী এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর– আখেরী নবীর বর্ণনা সুস্পষ্টরূপে উদ্ধৃত ছিলো। সঙ্গত কারণেই আহলে কিতাব তথা ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা বিশেষত তাদের মধ্য হতে যারা আরবে বসবাসরত ছিলো, তারা আখেরী নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো।

### আরব ভূখণ্ডে আহলে কিতাবের আগমন

**ইহুদী সম্প্রদায় :** আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন, ইহুদী জাতির উপর লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের ছাপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআনের এ আয়াতের যথার্থ বাস্তবায়ন হিসেবে ইহুদী জাতি সবসময়ই লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার সূচনা হয়েছিলো হযরত মূসা আ. এর পরবর্তী সময় হতেই। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪০-৭২১ অব্দে আসরীদের (Assyrians) কর্তৃক, ৭৪০ অব্দে আসরীয় সম্রাট Tiglath-Pileser III [745-727 BC] (তৃতীয় তিগলাস পিলেসার) কর্তৃক, ৭২১ অব্দে আসরী সম্রাট Sargon II [722-705 BC] (দ্বিতীয় সারগন) কর্তৃক, ৬১০ অব্দে মিসরীয়দের কর্তৃক, ৫৮৭ অব্দে সম্রাট (Nebuchadnezzar II) দ্বিতীয় বুখতে নাস্সার কর্তৃক, ৩৩৬-৩২৩ অব্দে বাদশা ইস্কান্দার (Alexander) কর্তৃক, ১৬১ অব্দে এন্টিওকাস (Antiochus) কর্তৃক এবং এরপর হযরত ঈসা আ.এর ঊর্ধ্বারোহনের পরবর্তী সময়ে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus) কর্তৃক এবং ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হেডেরিয়ান Hadrian [117-138 CE] কর্তৃক ফিলিস্তিনের ইহুদী বসতিতে ধ্বংসযজ্ঞের পর মূলত জাতিগতভাবে ইহুদীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইহুদী ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকরিয়াস এর বর্ণনামতে জেরুসালেম ধ্বংসের পর থেকেই ইসরাইলিদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। জেরুসালেমের ধ্বংসের পর ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু তো রয়ে গিয়েছিলো ব্যবিলনে, আর বাকিরা আরব, ইংল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু গোত্র হেজাযে এসে বসবাস শুরু করে। ইয়াসরিব (মদীনা), তাইমা, তাবুক, ফাদাক প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বাস ছিলো। আরবের ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্য হতে ইয়াসরিব (মদীনার)-এর বনু নযীর, বনু কুরাইযা এবং বনু কাইনুকা অন্যতম। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, শেষ নবীর আগমনকালে আরবে ইহুদী গোত্র সংখ্যা বিশোর্ধ ছিলো। (তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন; পৃষ্ঠা ২৫,২৬,৭৭, ৮১-৯৫, আল মুসতাওত্বনাতুল ইহুদিয়্যাহ আলা আহদির্ রাসূল; পৃষ্ঠা ৪৯-৬৮, ড. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত 'মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ ওয়ার্ রদ্দি আলা মাযায়িমিহিমিল বাতিলাহ; পৃষ্ঠা ২৬০, আর রহীকুল মাখতূম; পৃষ্ঠা ৩০, Encyclopedia Brittanica [15th Edition; U.S.A. 1990] 22/410,416, Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book VIII, ch. 6-8, (William L. Langer: An Encyclopedia of World History [Houghton Mifflin Company 1948] p. 64, 1 Maccabees [1:56-57])

**খ্রিস্টান সম্প্রদায় :** আরবে খ্রিস্টানদের আগমন ঘটে মূলত হাবশা (আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া)-এর খ্রিস্টানদের মাধ্যমে। ৩৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে ৩৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাবশীরা ইয়ামান দখল করে রাখে। এ সময়ই মূলত হাবশার খ্রিস্টান বাদশাহ কর্তৃক ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্ণর আবরাহার মাধ্যমে মক্কার কা'বা ভাঙার ষড়যন্ত্র করা হয়, যার

বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানে দখলদার খ্রিস্টান হাবশীদের মাধ্যমেই ইয়ামানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার লাভ করে। ইয়ামান থেকে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের দাওয়াতে প্রথমত আরবের 'নাজরান' এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। নাজরান থেকে ক্রমে এ খ্রিস্টধর্ম আরবের বিভিন্ন গোত্রে প্রচার লাভ করে। শেষ নবীর আগমনের সময় আরবের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্য হতে গাস্সান ও নাজরান এলাকার খ্রিস্টান, বনু তাগলিব, বনু তাঈ এবং কুদাআ গোত্র (-এর কিছুসংখ্যক) উল্লেখযোগ্য। (নজীবাবাদী রহ. কৃত, তারীখুল ইসলাম ১/৫৬, আর রহীকুল মাখতুম; পৃষ্ঠা ৩০)

**তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী**

এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আ.-এর পরবর্তী সময়ে তাদের উভয়ের উপর নাযিলকৃত আসমানীগ্রন্থ তাওরাত এবং ইনজিল অসাধু ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে গেছে। আর এ বিকৃতিতে যুগ পরম্পরায় ক্রমেই বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিকৃত তাওরাত ও ইনজিলে (এবং বর্তমানে তাওরাত ও ইনজিল নামে প্রচারিত বিকৃত 'বাইবেল' বা 'কিতাবুল মুকাদ্দাসে') আখেরী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর এমন কিছু 'ছাইচাপা স্ফুলিঙ্গ' রয়ে গেছে, শত বিকৃতির ঝঞ্ঝাও যাকে নির্বাপিত করতে পারেনি! এ মর্মে আমরা সামান্য কিছু দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করতে প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

**তাওরাতে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী**

(১) মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় (হাদীস-২৩৪৯২) এসেছে, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আবূ বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি.-কে সাথে নিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পুত্রের শিয়রে বসে তাওরাত পাঠরত এক ইহুদীর নিকট গমন করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟

অর্থ : ঐ সত্তার শপথ (দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি)! যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমার কিতাবে কি আমার বর্ণনা এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির আলোচনা রয়েছে?

ইহুদী মাথা নেড়ে নেতিবাচক উত্তর প্রদান করলে শায়িত পুত্র বলে উঠলো, 'ঐ সত্তার শপথ (দিয়ে বলছি)! যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের কিতাবে আপনার বর্ণনা এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির আলোচনা পেয়ে থাকি...'। এরপর সেই ইহুদীপুত্র কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করলো! নবীজী উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের (মুসলমান) ভাইয়ের কাছ থেকে ইহুদী (পিতা)-কে উঠিয়ে দাও'। এরপর নবীজী তার কাফন-দাফন এবং জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করলেন।

এছাড়া বর্তমানে প্রচারিত বিকৃত বাইবেলের তাওরাতঅংশেও শেষ নবীর আলোচনা রয়েছে–

'সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন'। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২)[১]

বাইবেলের ভাষ্যকাররা আদি পুস্তকে এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, এখানে 'পারণ' বলতে ঐ স্থানকেই বুঝানো হয়েছে, যে স্থানে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল আ. বসবাস করতেন অর্থাৎ মক্কার পর্বতশ্রেণী। আর হেরা পাহাড়– যেখানে আখেরী নবী নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন– ঐসব পর্বতশ্রেণীরই অংশ!

(২) মূসা আ. বলেন,[২]

'তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালোই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৭-১৯)

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে 'তাদের' বলে বনী ইসরাইলকে এবং 'ভাইদের' বলে ইসমাঈল আ. এর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, বনী ইসরাইল (ইসহাক আ. এর বংশধরগণ) হলেন বনী ইসমাঈল (ইসমাঈল আ. এর বংশধরগণ)-এর ভাই। (দ্র. আদি পুস্তক; অধ্যায় ১৬ অনুচ্ছেদ ১২) আর একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই ইসমাঈল আ. এর বংশধরের মধ্যে প্রেরিত একমাত্র নবী ও রাসূল।

**ইনজিলে শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী**

শেষ নবীর আগমনকালে খ্রিস্টানদের ইনজিলে যে শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী উল্লেখ ছিলো, একাধিক ঘটনার মাধ্যমে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

(১) বালক বয়সে নবীজীর শামে গমন এবং বুসরা এলাকার খ্রিস্টান পাদ্রী এবং ইনজিলের আলেম 'বাহীরা' কর্তৃক নবীজীকে দেখে আখেরী নবী হিসেবে চিহ্নিত করার ঘটনা, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) হেরা গুহায় জিবরাঈল আ. এর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর হযরত খাদীজা রাযি. কর্তৃক নবীজীকে 'ওরাকা ইবনে নওফেল–যিনি খ্রিস্টান হওয়ার পাশাপাশি ইঞ্জিলের আলেম ছিলেন–এর কাছে নিয়ে যাওয়া (যার বিবরণ সামনে আসছে) এবং ওরাকা কর্তৃক আখেরী নবী হিসেবে নবীজীকে চিহ্নিত করার ঘটনা।

এছাড়াও বর্তমানে প্রচারিত বাইবেলের বিকৃত ইনজিল অংশেও শেষ নবীর আলোচনা রয়েছে-

(১) হযরত ঈসা আ. বলেন,[৩]

'তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। (যোহন ১৪:১৫-১৬)

(২) হযরত ঈসা মসীহ আ. আরো বলেন,[৪]

'তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। (যোহন ১৪:২৫-২৬)

(৩) ঈসা আ. আরো বলেন,[৫]

১. The Lord came from Sinai, and dawned on them from Seir; He shone forth from Mount Paran (Deuteronomy 33:2;NKJV)

২. 17 'And the Lord said to me: 'What they have spoken is good. 18 I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. 19 And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. (Deuteronomy 18:17-19;NKJV)

৩. 15 'If you love Me, keep My commandments. 16 And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever. (John 14:15-16;NKJV)

৪. 25 'These things I have spoken to you while being present with you. 26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things (John 14:25-26;NKJV)

৫. 7 Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not

‘তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না। (যোহন ১৬:৭-৮)

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীত্রয়ে ‘তিনি বিশ্বাসীদের কাছে চিরকাল থাকবেন’, ‘তিনি সমস্ত বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিবেন’, ‘ঈসা আ. না গেলে সেই সাহায্যকারী বিশ্ববাসীর নিকট আসবেন না’ –বক্তব্যগুলো কেবল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কেননা, (১) তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের জন্য একমাত্র নবী ও রাসূল। (২) ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিন পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে। (৩) ঈসা আ.কে উঠিয়ে নেয়ার প্রায় পাঁচশত বছর পর একমাত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে এসেছেন!

তাওরাত ও ইনজিলের এ সকল সুস্পষ্ট বর্ণনার কারণে আহলে কিতাব তথা তাওরাত ও ইনজিলের অনুসারী ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বিশেষত তাদের মধ্য হতে যারা আরবে অবস্থান করতো, তারা দৃঢ় মনে আখেরী নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো। পবিত্র কুরআনে পাকে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

অর্থ : আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) এলো, যা তাদের কাছে (পূর্ব থেকে) আছে, তার (অর্থাৎ তাওরাতের) সমর্থন করে (তখন তাদের আচরণ লক্ষ্য করে দেখুন), যদিও পূর্বে এরা কাফেরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে (এ কিতাবের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে বিজয় প্রার্থনা করতো...! (সূরা বাকারা- ৮৯)

অর্থাৎ পৌত্তলিক বা মূর্তিপূজক মুশরিকদের সাথে যখন ইহুদীদের লড়াই হতো, তখন তারা দু‘আ করতো যে, হে আল্লাহ! আপনি তাওরাতে যে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাকে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন, যাতে তার সাথে মিলে আমরা পৌত্তলিকদের উপর জয়ী হতে পারি। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা বাকারা- ৮৯), সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৪৮)

সারকথা, শেষ নবীর ব্যাপারে তাওরাত ও ইনজিলের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা যখন শেষ নবীর আগমনপ্রতীক্ষায় ছিলো, পাশাপাশি আহলে কিতাবের কাছে শুনে শুনে আরবের পৌত্তলিকরাও যখন আখেরী নবীর প্রতীক্ষায় ছিলো, ঠিক এমনই মুহূর্তে হেজাযের পবিত্র মক্কা নগরী থেকে তিন মাইল দূরে হেরা পর্বতের এক গুহায় জ্বলে উঠলো সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক্ষিত মশাল, যার উজ্জ্বল আভায় বিদূরিত হলো মিথ্যা ও অন্যায়ের সকল আঁধার!

**নবুয়তের সূচনা : সত্য স্বপ্ন ও হেরা গুহার নির্জনতা**

নবুওয়াতপ্রাপ্তির সূচনালগ্নে প্রথমত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর ও স্পষ্ট অর্থবহ স্বপ্ন দেখতেন, যা প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মতই সত্য প্রমাণিত হতো। মূলত এ স্বপ্ন ছিলো সুবহে সাদিকের উজ্জ্বল আভার মতো নবুওয়াত-রবি উদয়ের বার্তাবাহক! এরপর ক্রমেই নবীজীর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। কেননা নির্জনতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কামনার মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহ তা‘আলার সুন্নাত হলো, যখন তিনি কারো প্রতি বিশেষ রহমত দানের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার অন্তরে নির্জনতায় আল্লাহর ইবাদাতে আত্মমগ্ন হওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। ফলে তিনি মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী হেরা পর্বত (বর্তমানে যাকে ‘জাবালে নূর’ বলা হয়)-এর গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করতে লাগলেন। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় সেখানে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্ব হতে নবীজী প্রতি বছর পবিত্র রমাযানের একমাস হেরা গুহার নির্জনতায় অবস্থান করতেন। তবে কারো কারো মতে (যেমনটি বলেছেন, আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., দ্র. ফয়যুল বারী; হা.নং ৩) নবীজী রমাযান মাসের বাইরেও গারে হেরায় ই’তিকাফ করতেন। অবস্থানকালীন সময়ে নবীজী (খাবার ইত্যাদির প্রয়োজনে) পরিবারের নিকটও কিছুদিন পরপর আসা-যাওয়া করতেন।

এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, নবীজী হেরা গুহায় কী ইবাদত করতেন? গ্রহণযোগ্য মত হলো, নবীজী এ সময় হযরত ইবরাহীম আ. এর দীনের অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩, ফাতহুল বারী; হা.নং ৩, উমদাতুল কারী; হা.নং ৩, ইরশাদুস সারী; হা.নং ৩, ইনআমুল বারী; ১/২১০, হাফেয যাহাবী রহ. কৃত ‘তারীখুল ইসলাম ১/৪২১, শিবলী নোমানী ও সুলাইমান নদভী রহ. কৃত ‘সীরাতুন্নবী ১/১৩৪, সীরাতে মুস্তফা ১/১২৯)

**কত বছর বয়সে নবীজী নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং তা কত তারিখে?**

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস পূর্ণ হলো, তখন রমাযান মাসের ১৭ তারিখে নবীজী নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। জিবরাঈল আ. হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ওহী নিয়ে আগমন করেন। তবে কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে নবীজী রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ, রোজ সোমবার নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। উভয় মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করা হয় যে, রবিউল আউয়াল মাস থেকে রমযান পর্যন্ত লাগাতার ছয় মাস সুন্দর, সুস্পষ্ট ও সত্যস্বপ্ন দেখার ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর রমাযান মাসে হযরত জিবরাইল আ. আগমন করেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫৪৮, ৩৮৫১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩৪৭, ফাতহুল বারী; হা.নং ৩, ৩৮৫১, ৬৯৮২, উমদাতুল কারী; হা.নং ৩, যাদুল মা‘আদ ১/৭৬)

**হেরা গুহায় নূরের বার্তাবাহক![1]**

এভাবেই যখন সত্য ও সুস্পষ্ট অর্থবহ স্বপ্ন ও নির্জনতা প্রিয়তার ভূমিকাও শেষ হলো, তখন একদিন সেই সৌভাগ্যের মুহূর্তটি এসে গেলো, যা ছিলো কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হেদায়াত ও সরলপথপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। আগমন করলেন সেই নূরের ফেরেশতা, আসমানের উপর থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে যিনি এসেছিলেন হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আ. এর নিকট। নবীজীর সামনে উপস্থিত হয়ে জিবরাঈল আ. বললেন,

إقرأ

অর্থ : পড়ুন!

নবীজী বললেন,

ما أنا بقارئ

অর্থ : ‘আমি পড়তে জানি না।’[1]

---

go away, the Helper will not come to you (John 16:7-8;NKJV)

১. হেরা গুহায় হযরত জিবরাঈল আ. এর আগমন এবং নবীজীর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ণ ঘটনাটি সহীহ বুখারী; হা.নং ৩ এবং মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৯৫৯-এ বর্ণিত হয়েছে।

এ কথার পর হযরত জিবরাঈল আ. নবীজীকে বুকে জড়িয়ে সজোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো (আল্লাহই সর্বোজ্ঞ) যেন নবীজীর মাঝে আসমানী ফেরেশতার এ সংস্পর্শের প্রভাবে 'আসমানী ওহী' ধারণ করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এরপর পুনরায় পড়তে বললে নবীজী একই জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বার জিবরাঈল আ. নবীজীকে চাপ দিলেন। এভাবে তিনবার নবীজীর আপরগতা প্রকাশ এবং জিবরাঈল আ. এর চাপ দেয়ার পর জিবরাঈল আ. বললেন,

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم

অর্থ : (হে নবী!) আপনি পাঠ করুন নিজ প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আপনি পাঠ করুন! আর আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত দানশীল। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না। (সূরা আলাক- ১-৫)[২]

অর্থাৎ নিজ ক্ষমতায় নয়; বরং আপনি পড়ুন আপনার প্রতিপালকের সাহায্যে। তিনিই আপনাকে জ্ঞান দান করবেন, যেভাবে তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন...! (ফাতহুল বারী; হা.নং ৩)

এরপর নবীজী এ আয়াতগুলো পাঠ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা হেতু যেভাবে হযরত মূসা আ. হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়ার কারণে ভয় পেয়েছিলেন, তেমনি নবীজীও (নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দিগ্ধতার কারণে নয়; বরং) অকস্মাৎ মাটির তৈরি মানবীয় অস্তিত্বে নূরের তৈরি ফেরেশতার উপস্থিতি এবং অত্যন্ত ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত 'ওহী' দান করার কারণে নবীজী মানবীয় দুর্বলতা হেতু মানসিকভাবে ভীত হয়ে গেলেন। (ফাতহুল বারী; হা.নং ৩, ইনআমুল বারী ১/২১৬)

ভীতির মাত্রা এতটাই বেশি ছিলো যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রাযি. এর কাছে গিয়ে নিজ প্রাণের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। প্রিয় সহধর্মিণী তখন সহযোগী এবং সহমর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কেননা, গোলাম মাইসারার সুসংবাদের পর হতে এ দিনটির জন্যই তো হযরত খাদীজা রাযি. অপেক্ষা করছিলেন! কাজেই দৃঢ়কণ্ঠে তিনি নবীজীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق،

অর্থ : কখনোই নয়! আল্লাহর কসম! কখনোই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। (কেননা,) আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে থাকেন। অসহায়-দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, বিপদ-আপদে (অন্যের) সহযোগিতা করেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২হি.) বলেন, 'উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযি. তার এ সান্ত্বনা বাণীতে নবীজীর এমন চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাতে উত্তম চরিত্রের আর কোনো দিক বাকী ছিলো না'! এরপর হযরত খাদিজা রাযি. নবীজীকে আপন চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নওফেল-এর কাছে নিয়ে যান। ওরাকা জাহিলী যুগে আরবের মূর্তিপূজায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্য দীনের সন্ধানে শামে গিয়ে হযরত ঈসা আ. এর কয়েকজন সঠিক অনুসারীর সংস্পর্শে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ওরাকা ইবরানী এবং আরবী ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় তরজমাকৃত[৩] ইনজিলের অনুলিপি তৈরি করতেন এবং আরবী ভাষায় তার অনুবাদও করতেন। যদ্দরুণ তাওরাত ও ইনজিলে শেষ নবীর যে আলামত এবং নিদর্শনাবলী ছিলো, সে ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। (দ্র. ফাতহুল বারী; হা.নং ৩, ইনআমুল বারী ১/২২৫)

কাজেই প্রথমত হযরত খাদীজা রাযি. এবং দ্বিতীয়ত হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরাঈল আ. এর আগমন ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে তিনি শেষ নবীকে সত্যায়ন করে বললেন,

'এ (ফেরেশতা) তো সেই 'রহস্যের ধারক', যার আগমন ঘটেছিলো হযরত ঈসা এবং হযরত মূসা আ. এর উপর! হায়! যদি আমি আপনার (ইসলামের) দাওয়াতের সময়কালে যুবক হতাম! হায়! যদি আপনার কওম যখন আপনাকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে, তখন আমি জীবিত থাকতাম, তবে আমি দৃঢ়ভাবে আপনার সহযোগিতা করতাম! (ফাতহুল বারী; হা.নং ৩)

যে কওম এবং জাতি স্বয়ং নবীজীকে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিলো, যে কওম ঝগড়া-বিবাদে নবীজীর সিদ্ধান্তকে নির্বিবাদে মেনে নিতো, সে কওমের এমন আচরণের কথা শুনে নবীজী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কওম আমাকে বের করে দেবে?'

ওরাকা বললেন, 'ওহী নিয়ে যেই আগমন করেছে, তার সাথেই লোকেরা শত্রুতা পোষণ করেছে...!

**(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

১. অর্থাৎ আমি 'নিরক্ষর'। কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত জিবরাঈল আ. এ সময়ে একটি লিখিত ফলক নিয়ে এসেছিলেন, যা লক্ষ্য করে তিনি হযরত জিবরাঈল আ. নবীজী কে পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তখন নবীজী এ কথা বলেন যে, 'আমি তো নিরক্ষর'। (সীরাতে ইবনে হিশাম; ১/২৭৩), (ইনআমুল বারী; ১/২১৩) কোনো কোনো বর্ণনায় (ফাতহুল বারী; হা.নং ৩) এমনটিও রয়েছে, নবীজী তৃতীয় বারে ما أنا بقارئ (আমি নিরক্ষর)-এর পরিবর্তে كيف أقرأ (আমি কীভাবে পড়বো) রয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তিতে কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন, ما أنا بقارئ -এর অর্থ হলো, 'আমি পড়তে পারছি না'। অর্থাৎ পড়তে না পারার বিষয়টি 'নিরক্ষতার কারণে নয়; বরং যেহেতু 'ওহী' অত্যন্ত ভারী জিনিস- যেমনটি পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (সূরা মুযযাম্মিল- ৫) কাজেই অকস্মাৎ একজন আসমানী ফেরেশতার উপস্থিতিতে মানবীয় দুর্বলতা ও মানসিক ভীতির দরুণ এত ভারী জিনিস যবানে পাঠ করা নবীজীর জন্য সম্ভব হয়ে উঠছিলো না। (সীরাতে মুস্তফা ১/১৩২)

২. মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় (হাদীস-২৫৯৫৯) এসেছে যে, এ সময় জিবরাঈল আ. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করেন। সূরা আলাকের প্রথম এই পাঁচটি আয়াতই কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা আলাক- ১)

৩. অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিলো ইবরানী ভাষায়, আর ইনজিল অবতীর্ণ হয়েছিলো সুরিয়ানী ভাষায়। কাজেই ওরাকা ইবনে নাওফেল হয়তো সুরিয়ানী ভাষার ইঞ্জিল হতে ইবরানী ভাষায় এবং আরবী ভাষায় ভাষান্তর করতেন অথবা ইবরানী ভাষায় অনুবাদকৃত ইঞ্জিলের ইবরানী ভাষায় অনুলিপি তৈরি করতেন এবং আরবী ভাষায় তার ভাষান্তর করতেন।

গ্রন্থ পরিচিতি

জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত

# একটি পর্যালোচনা

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

পথবিচ্যুত হওয়া এবং পথবিচ্যুত করার নোংরা খেলায় মেতেছে পরিচিত একটি মহল। উম্মাহ-বর্জিত বিচ্ছিন্ন কিছু ধারণাকে সম্বল করে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফেতনার বিষ। সরলপ্রাণ মুসলমান হয়ে পড়ছে তাদের ঘৃণ্য খেলার অবুঝ ক্রীড়নক। হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ও হকের অনুগামী জনসাধারণের চিরায়ত আমলগুলোকে ভুল আখ্যা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বিদআতী, মুশরিক বলে গালমন্দ করা হচ্ছে। তাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য আমল জাল-যঈফ হাদীস নির্ভর বলে প্রপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে। হক ও হক্কানিয়্যাতের পতাকাবাহী উলামায়ে কেরাম নিজেদের আমলের স্বপক্ষে কোন হাদীস পেশ করলে তা যঈফ বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। 'জাল জাল' ধ্বনি তুলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে।

মুস্তাহাব, মাকরূহে তানযীহ পর্যায়ের বিধান, তারগীব, তারহীব, সাওয়াব, ইকাব, মাগাযী, মালাহিম, মানাকিব, মাকারিমে আখলাক, সিয়ার, তাফসীর ইত্যকার বিষয়ে কোন হাদীস পেশ করা হলে যঈফ হওয়ার অপরাধে(?) আমলটাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। তার উপর আমল করাকে বলা হচ্ছে নাজায়েয, বিদআত। যঈফ ও মওযূ (জাল) হাদীসকে এক সারিতে গণ্য করা হচ্ছে। উভয়টাকে সমপর্যায়ের মনে করা হচ্ছে।

অথচ যঈফ ও জাল হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট। জাল হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই নয়। হতে পারে সেটা কোন সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ, কবি, হাকীম, সুফী-বুযর্গের কথা অথবা অন্য করো মনগড়া বানানো কথা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কেউ চালিয়ে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে, যঈফ হাদীস হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস; কারো মনগড়া কথা নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে যঈফ বলা হচ্ছে সনদ বা সূত্রের কারণে; যে সকল ব্যক্তিদের পরম্পরায় হাদীস পরবর্তীদের নিকট পৌঁছেছে তাদের মধ্যে কারো মেধা কম হওয়ার কারণে অথবা সূত্রবিচ্ছিন্নতার কারণে বা আকীদাগত ত্রুটি বা অন্য কোন ত্রুটির কারণে। সুতরাং মওযূ বা জাল হাদীসকে যেমন হাদীস মনে করা মারাত্মক ভুল তেমনি যঈফ হাদীসকে মওযূ বা জাল বলা চরম মুর্খতা ও স্পষ্ট গোমরাহী এবং এটা গোটা উম্মাহ থেকে বিচ্যুত মত ও পথ। আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু নব্য গবেষক এই বিচ্যুত মতকেই একমাত্র পথ ও মত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সেই তথাকথিত নব্য গবেষকদের একজন হলেন, রাজশাহী জেলার বাঘা থানার জনাব মুযাফফার বিন মুহসিন। তার লেখা **'জাল হাদীসের কবলে** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি **ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত' যার** আরবী নাম صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقبضة الأحاديث الضعيفة والموضوعة বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা তুলে ধরব ইনশা-আল্লাহ।

**বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

লেখক কিতাবটিকে ১৬ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ ভূমিকাসহ নিম্নোক্ত ১৩ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন–

পবিত্রতা (ওযু ও তায়ম্মুম), ছালাতের ফযীলাত, মসজিদ সমূহ, ছালাতের সময়, আযান ইকামত, জামা'আত ও ইমামতি, ছালাতের পদ্ধতি, ক্বাযা ছালাত, সফরের ছালাত, সুন্নাত ছালাত সমূহ, বিতর ছালাত সমূহ, ছালাতুল জুমু'আ, ছালাতুল জানাযা

**বইটির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা**

বইটি সম্পর্কে উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, প্রখ্যাত লেখক, গবেষক হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. বলেন,

'জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত' নামের বইটি ইলমী মুনাকাশার চেয়ে অপবাদ ও না-ইনসাফিরই উপর বেশি নির্ভরশীল। বইটির নাম থেকেই যা অনুমেয়। এর আরবী নামটিও বড় অদ্ভুত। صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقبضة الأحاديث الضعيفة والموضوعة নাম তো আক্রোশে ঠাসা, কিন্তু বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে শূন্য! (মাসিক আল কাউসার ২০১৪ আগস্ট সংখ্যা)

মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেবের **'জাল হাদীসের কবলে** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর **ছালাত'** বইটি পড়ে মনে হয়েছে, মুসলিম সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য এটি একটি অত্যন্ত উপাদেয় বস্তু।

এ মন্তব্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটাই বাস্তব। বইটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একবার পড়লেই পাঠক আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। সময় না থাকলে নিম্নের পয়েন্টগুলোতে শুধু নজর বুলালেও লেখক ও তার কিতাবের সূরতহাল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

লেখক সাহেব শান্ত মুসল্লীদেরকে অশান্ত ও অস্থির করে তুলতে যে কথা যেভাবে বললে কাজ হবে তিনি সেভাবেই সেটা উপস্থাপন করেছেন। দেখুন না, সূচীপত্রের পূর্বের পাতায় তার বর্ণনাভঙ্গি–

'সম্মানিত মুছল্লী!

১. আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করেন?

২. আপনি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছালাত ও আপনার ছালাতের মাঝে কত পার্থক্য?

৩. আপনার ছালাত সঠিক হচ্ছে কি-না তা যাচাই করেছেন কি?

৪. আপনি কি বড় বড় আলেম অসংখ্য মানুষের দোহাই দেন? কবরে ও হাশরের ময়দানে তারা কি কোন কাজে আসবে? তাহলে আপনার আমলগুলো যাচাই করেন না কেন?

এ হল নিরীহ জনসাধারণকে হক্কানী আলেম-উলামার প্রতি আস্থাহীন করে তোলার প্রথম মুযাফফরী ডোজ। যে দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ মুসলিম কুরআন-হাদীসের অর্থ-মর্ম বুঝা তো দূরের কথা সহীহভাবে কুরআনের শব্দগুলোও তিলাওয়াত করতে জানে না তিনি তাদেরকে তালিম দিচ্ছেন যে, তোমার নামাযটা বাপু তুমিই যাচাই করে দেখো, সেটা সহীহ হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে কি না? এ যেন তিন দিনের অভুক্তকে

মেশিনপত্র ক্রয় করে চাল-ডালের পুষ্টিমান যাচাইয়ের পরামর্শ!!

সূচীপত্রের পরে তিনি ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ভূমিকা পেশ করেছেন।

১৩ পৃষ্ঠায় (ভূমিকাতে) লিখেছেন, সমাজে প্রচলিত ছালাতের নিয়ম পদ্ধতিগুলো সবই ক্রুটিপূর্ণ। ওযু, তায়াম্মুম, ছালাতের ওয়াক্ত, আযান, ইকামাত, ফরয, নফল, বিতর তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, জুমু'আ, জানাযা, ঈদের ছালাত সবই বিদআতে ভরপুর। যঈফ ও জাল হাদীসে পরিপূর্ণ। তাই রাসূলের ছালাতের সাথে আমাদের ছালাতের কোন মিল নেই।

১৬ পৃষ্ঠায় (ভূমিকাতে) লিখেছেন, চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো দেশে প্রচলিত ইসলামী দলগুলো সমাজ সংস্কারের দাবী করছে এবং এজন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের মধ্যে রাসূলের ছালাত নেই। মাযহাব ও তরীকার নামে যে ছালাত প্রচলিত আছে সেই ছালাতই আদায় করে যাচ্ছে।

১৮ পৃষ্ঠায় (ভূমিকাতে) লিখেছেন, যে সমস্ত ছাত্র ও যুবক বিদআতী ছালাতে অভ্যস্ত থাকে এবং যাচাই না করেই ছালাত আদায় করে তাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই।

মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেবের এ সকল বক্তব্যের সারাংশ হল, প্রচলিত সালাত তথা আমাদের নামাযের কোন ভিত্তি নেই। আমাদের সালাত বিদআতি সালাত। সবটুকুই যঈফ-জাল হাদীসের কবলে বন্দী। রাসূলের সালাতের সাথে আমাদের সালাতের কোন মিল নেই। কতটা নির্ভীক ও বে-ইনসাফি মেজাযের হলে ১৪ শত বছর যাবত ধারাবাহিক চলে আসা সহীহ হাদীস সম্মত ও গোটা উম্মতের স্বীকৃত সালাতের ব্যাপারে কেউ এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও জঘন্য মন্তব্য করতে পারেন!!

১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত বলেছেন বা করেছেন, তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকরদের জিজ্ঞাসা কর।

মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেব এখানে কত বড় খেয়ানত, ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন দেখুন, তিনি بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ কে فَاسْأَلُوا এর সঙ্গে যুক্ত করে অর্থ করেছেন– 'স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকরদের জিজ্ঞাসা কর' তার এ অনুবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী, কোন তাবে তাবেয়ী, অদ্যাবধি কোন মুফাসসির এবং কোন হক্কানী আলেম করেননি। কেবল মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেবই এই অনুবাদ করেছেন। অজান্তে নয়, তিনি জেনে বুঝেই শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন বিকৃতির এ ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেহেতু যে কোন মূল্যে রাসূলের সালাত জাল হাদীসের কবল থেকে রক্ষা করতেই হবে (?)

**আয়াতটির সহীহ অনুবাদ হল–** তোমরা যদি না জান তবে আহলে যিকর তথা হক্কানী আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা কর। আমি রাসূলদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও কিতাবসমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছি।

২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যে ব্যক্তি ছালাতে স্বশব্দে আমীন বলবে এবং ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে। তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। (ছহীহ বুখারী/৭৮০)

মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেব এখানেও কত বড় খেয়ানত ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছেন দেখুন, সহীহ বুখারীর এই হাদীস কেন, বুখারীর কোন হাদীসেই স্বশব্দে আমীন বলার কথা নেই। এ হাদীসের অনুবাদে তিনি 'স্বশব্দে' অংশটুকু নিজের পক্ষ থেকে জালিয়াতি করেছেন। জাল হাদীসের কবল থেকে রাসূলের সালাতকে বাঁচাতে গিয়ে মুযাফফার বিন মুহসিন সাহেব নিজেই জাল...।

১২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ছুবহে ছাদিকের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। **সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়।** এ পর্যন্ত লিখে তিনি ৪৫৫ নং টীকা যুক্ত করেছেন। টীকায় তিনি তাঁর উপরিউক্ত কথার বরাত দিয়েছেন বুখারী শরীফের ৫৫৬ ও ৫৭৯নং হাদীসের।

বরাত অনুযায়ী নম্বর দু'টিতে ঐরূপ কোনো হাদীস আমরা পাইনি। নম্বর দু'টিতে যে হাদীসটি আছে তা এই–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পায় তখন সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে এবং যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে সালাতে ফজরের এক রাকআত পায় সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে।'

এখন লেখক হয়তো বলবেন, 'আমি এই হাদীসের বরাত দিয়েছি আমার শেষোক্ত বাক্য 'সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়'-এর সমর্থনে'। কিন্তু লেখকের বিরুদ্ধে তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, এই হাদীসে তো তা বলা হয়নি। এই হাদীসে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হল, ফজরের এক রাকআত পড়ার পর যদি সূর্য উদিত হয়ে যায় তবে সূর্যোদয়ের কারণে সে যেন সালাত পরিত্যাগ না করে, বরং সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে নেয়। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকআত আদায় করতে পারলে তার দ্বিতীয় রাকআতটি সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আদায়কৃত হলেও তার সালাত হয়ে যাবে। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত নয় বরং সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আদায় করার কথা বলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সালাত আদায় অন্যান্য হাদীসের বক্তব্য মতে হারাম। সে সব হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের বক্তব্য সাংঘর্ষিক হওয়ায় এই হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র কী তা নির্ণয়ে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। সেটি স্বতন্ত্র এক আলোচ্য বিষয়।

**'সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়।'** লেখকের এ কথাটি এই হাদীসে তো নয়ই কোনো হাদীসেই নেই। দেখুন, লেখক প্রথমে বলেছেন যে, ছুবহে ছাদিকের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এটি শুধু লেখকের বক্তব্য নয়, ওয়াক্ত সংক্রান্ত সব হাদীসের বক্তব্যও তাই। সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যখন ফজরের ওয়াক্ত থাকে তখন সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর আদায় করা সর্বাবস্থায় বৈধ হবে। কোন সমস্যা বা ওজর থাকুক চাই না থাকুক। 'সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়'– লেখকের এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, সমস্যা না থাকলে সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত আদায় করা যাবে না। অথচ একটু পূর্বে তিনি বলে আসলেন যে, ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। লেখকের বক্তব্য এখানে স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে। আসলে 'সমস্যাজনিত কারণে' শর্তটি লেখক নিজের পক্ষ হতে যুক্ত করে দিয়েছেন। সহীহ হাদীস জাল হয়ে যায় এভাবেই।

আমরা ভাবছি, লেখক জাল হাদীসের কবল হতে সালাতকে মুক্ত করার অভিযানে নেমে নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতকে জাল হাদীসের কবলে ফেলে দিলেন না তো? এবং নিজেই নিজের জালিয়াতির জালে আটকা পড়ে গেলেন না তো?

১৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ইক্বামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া দেয়ার পক্ষে গোঁড়ামী করা'

এই শিরোনামের মধ্যে ইকামাতের বাক্যগুলো একবার করে দেয়ার পক্ষে বরং তাঁরই গোঁড়ামির সন্ধান মেলে। হাদীস যখন দুই পক্ষেই আছে যেমনটা তিনি স্বীকার করেছেন তখন কোনো পক্ষেরই গোঁড়ামি করা উচিত নয়। যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো দুই দুই বার করে বলার পক্ষপাতি তাঁরা যদি একবার করে যাঁরা বলেন তাঁদের বিরূদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতেন তাহলে তা হতো গোঁড়ামি। তিনি যদি বলেন, সবসময় ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলা এবং কখনও একবার করে না বলাটাই গোঁড়ামি তাহলে তাঁর নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা– আপনারা কি মাঝে-মধ্যে ইকামতের বাক্যগুলো দুই বার করে বলে থাকেন? আমার এবং অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো এই যে, যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো এক বার করে বলার পক্ষপাতি তাঁরা কখনও দুই বার করে বলেন না। তাহলে সেটাও তো আপনার চিন্তাধারা অনুযায়ী গোঁড়ামি হল। তাহলে গোঁড়ামির অভিযোগের তীর শুধু তাঁদের দিকে কেন ছুঁড়ে দিলেন যাঁরা ইকামতের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার পক্ষপাতি?

এই শিরোনামের শুরুতে তিনি লিখেছেন, 'ইক্বামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয। এর পক্ষে দু'একটি হাদীছ রয়েছে। কিন্তু এর উপর যদিও গোঁড়ামী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ, ইক্বামত একবার করে বলাই উত্তম। এর পক্ষেই বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে।'

যাহোক লেখক স্বীকার করলেন যে, ইকামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয। দুই একটি হলেও এর পক্ষে হাদীস আছে এটাও তিনি স্বীকার করলেন। এতে অন্তত এতটুকু স্বস্তি পাওয়া গেল যে, এ দেশের ইকামত অন্তত জাল হাদীসের(?) কবলে পড়েনি।

**২১৫ পৃষ্ঠায়** হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বর্ণিত নাভীর নীচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, 'বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। নাভীর নীচে কথাটুকু হাদীসে নেই। সুতরাং এই অংশটুকু জাল করা হয়েছে।' অতঃপর লেখক তার দাবীর পক্ষে শায়খ হায়াত সিন্ধির বক্তব্য তুলে ধরেছেন। হায়াত সিন্ধি দাবী করেছেন, তিনি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার কোন পাণ্ডুলিপিতে এ অংশটুকু পাননি।

কিন্তু হায়াত সিন্ধি হাদীসটি পাননি বলেই এটি ভিত্তিহীন হয়ে যাবে– এটা কেমন কথা? যারা পেয়েছেন বলে বলেছেন, তারা কি মিথ্যা বলেছেন?

পাঠক! লক্ষ্য করুন, হায়াত সিন্ধির ইন্তেকাল হয়েছে **১১৬৩** হিজরীতে। তারই সমসাময়িক ছিলেন মুহাম্মদ কায়েম সিন্ধি (মৃত্যু : ১১৫৭ হি.)। তিনি শেষ জীবন হিজায তথা মক্কা-মদীনাতে কাটিয়েছেন এবং সেখানেই হাদীস শরীফের অধ্যাপনার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তার ফাওযুল কিরাম গ্রন্থে লিখেছেন..., (অর্থ :) হাদীসের হাফেয শায়খ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন এ অংশটুকু মুসান্নাফে আছে। আমি নিজেও একটি পাণ্ডুলিপিতে তা দেখেছি। এটি শায়খ মুফতী আব্দুল কাদের সাহেবের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও বিদ্যমান আছে। এত কিছুর পরও এটাকে ভুল বলা ইনসাফের কথা হতে পারে না। আমি তো নিজ চোখে বিশুদ্ধ একটি পাণ্ডুলিপিতে এ অংশটুকু দেখেছি। (আছারুস সুনান; পৃষ্ঠা ৯০)

একইভাবে মুহাম্মদ হাশেম সিন্ধি (মৃত্যু : **১১৭৪** হি.) তার তারসিউদ দুররাহ আলা দিরহামিস সুররাহ গ্রন্থে তিনটি পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লামা হাফেয কাসেম ইবনে কুতলুবুগার পাণ্ডুলিপি।

২. মক্কা শরীফের মুফতী আল্লামা আব্দুল কাদের ইবনে আবূ বকর আস-সিদ্দিকীর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপি।

৩. আল্লামা মুহাম্মদ আকরাম সিন্ধির (মৃত্যু ১১৩০ হি.) নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি।

দ্বিতীয় দু'টি পাণ্ডুলিপি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলেও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। (আছারুস সুনান, পৃ.৮৫)

এমনিভাবে এটি আল্লামা আবেদ সিন্ধির (মৃত্যু ১২৫৭ হি.) নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ছিল ও আছে। আল্লামা মুরতাযা হাসান যাবীদী (মৃত্যু ১২০৫ হি.) নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ছিল ও আছে। বর্তমানে এই পাণ্ডুলিপিটি তিউনিসে আছে। এই দু'টি পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পাদনাপূর্বক মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার যে সংস্করণ তৈরি করেছেন, যা ২৬ খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে **৩৯৫৯** নম্বরে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে উক্ত দুটি পাণ্ডুলিপির যে যে পৃষ্ঠায় হাদীসটি উদ্ধৃত রয়েছে তার ফটোও তুলে দেয়া হয়েছে।

২০২ পৃষ্ঠায় বলেছেন,

'জ্ঞাতব্য : রাফউল ইয়াদাইনের সুন্নাতকে রহিত করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ছাহাবীর নামে উক্ত হাদীসগুলো জাল করা হয়েছে।'

হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ সনদ ও সূত্রসহ যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন, সেই সনদে যদি কোন মিথ্যুক রাবী থেকে থাকে, তাহলেই সাধারণত হাদীসটিকে জাল বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসটি ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে আবী শায়বা স্বীয় মুসান্নাফে, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে, আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদে এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে এটি আলকামা (বুখারী-মুসলিমের রাবী) বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (বুখারী-মুসলিমের রাবী), তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আসিম ইবনে কুলায়ব (মুসলিমের রাবী), তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরী (বুখারী-মুসলিমের রাবী), তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ওয়াকী ইবনুল জাররাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (তারাও বুখারী-মুসলিমের রাবী)। তাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শায়বা, আহমাদ, হান্নাদ, মাহমুদ ইবনে গায়লান, সুয়াইদ ইবনে নাসর ও যুহাইর প্রমুখ। তাদের কাছ থেকেই বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী প্রমুখ।

এখন এই হাদীসকে জাল বলতে হলে মুযাফফর সাহেবকেই বলতে হবে যে, কে তা জাল করেছেন। সংকলকগণ? না সনদের অন্য কোন রাবী?

ইবনে মাসউদ রাযি. এর এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন ইবনে হাযম জাহেরী তার মুহাল্লায়, আল্লামা আহমাদ শাকের তার তিরমিযীর টীকায়, আলবানী সাহেব আবূ দাউদের টীকায়। শুআইব আল

আরনাউত মুশকিলুল আছারের টীকায়, হুসাইন সালীম আসাদ মুসনাদে আবূ ইয়ালার টীকায়। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান। প্রশ্ন হল, এটি জাল হলে এ সকল বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান বললেন কীভাবে?

৩৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, মাগরিবের ছালাত দিনের বিতর ছালাত। তাহকীক : উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বিতর ছালাত মাগরিবের ছালাতের ন্যায় প্রমাণ করতে চান। অথচ তা ক্রুটিপূর্ণ। বর্ণনাটি কখনো মারফু সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে। তবে এর সনদ যঈফ। মুহাদ্দিস শুআইব আরনাউত বলেন, ঐঅংশটুকু সহীহ নয়।

(ক) এখানেও তিনি তাহকীকের নামে কী পরিমাণ গোলমাল করেছেন তা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি-

১. লেখক তার বক্তব্য 'অথচ তা ক্রুটিপূর্ণ' দ্বারা কোন কথাটিকে ক্রুটিপূর্ণ বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি কি বলতে চাচ্ছেন বর্ণনাটি ক্রুটিপূর্ণ? প্রকৃতপক্ষে তার বর্ণনাই ক্রুটিপূর্ণ।

২. তিনি বলেছেন, বর্ণনাটি কখনো মারফু সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে।

মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে–

(ক) একটি 'মারফু' তথা নবীজীর বক্তব্য, আর একটি 'মাওকুফ' তথা ইবনে উমরের বক্তব্য।

(খ) একটি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. (মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য) আর অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (মুয়াত্তা মালেক)

(গ) দুটি বর্ণনার বক্তব্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মারফু বর্ণনাটি এই–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ"

ইবনে সীরীন র. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের নামায দিনের বিতর। সুতরাং তোমরা রাতের নামাযকেও বিতর করে পড়।

মাওকুফ বর্ণনাটি এই–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার র. বলেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলতেন, মাগরিবের সালাত দিনের সালাতের বিতর।

(ঘ) বর্ণনা দু'টিতে কোন বিরোধ নেই বরং আপন আপন স্থানে দু'টি বর্ণনাই সঠিক।

সুতরাং দুটিকে এক বর্ণনা বানিয়ে দেয়ার যুক্তি নেই। এ কারণে ইমাম ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) দুটি বর্ণনাকেই উল্লেখ করে যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন (আল ইসতিযকার ৫/২৮৩)

(৩) লেখক চরম দুঃসাহসিকতার সাথে 'মারফু' ও 'মাওকুফ' এর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করেই বলেন, 'তবে এর সনদ যঈফ' এর দ্বারা বুঝা যায় মওকুফ বর্ণনাটিও যঈফ!

**(খ) মাওকুফ বর্ণনাটি কি যঈফ?**

পূর্বেই বলেছি, এখানে দু'টি বর্ণনার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি সনদ রয়েছে। প্রশ্ন হল, এর কোন সনদটি যঈফ? কে তা যঈফ বলেছেন এবং কেনই বা যঈফ বলেছেন? –লেখক এর কিছুই বলেননি এবং তার বক্তব্যের পক্ষে কোন বরাতও উল্লেখ করেননি। তাহলে কি এটি তার 'নিজস্ব' ভিত্তিহীন বক্তব্য! যা অনুসরণ করতে তিনি পাঠককে বাধ্য করতে চান?! কোন ইমাম বা মুহাদ্দিস এ মওকুফ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন এর প্রমাণ কি লেখক দিতে পারবেন?

দেখুন, লেখক যে বর্ণনাটি উল্লেখ করে টীকায় মুয়াত্তা/২৫৪ এর বরাত দিয়েছেন- এটি ইমাম মালেক তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, আর তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমাম মালেক ও সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বাদ দিলে থাকে কেবল- আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। তিনি বুখারী মুসলিমসহ ছয় কিতাবের রাবী। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাঈন, আবূ যুরআ, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইজলী ও ইবনে সাদ প্রমুখ সকল ইমামই তাঁকে সিকাহ( বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল) ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম ও হুজ্জাহ উপাধি দিয়েছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা) ইবনে হাজার (তাকরীবে) ও সুয়ূতী (ইসআফে) তাকে সিকাহ বলেছেন। এমন বর্ণনাকারীকে যঈফ বলার সাধ্য কি লেখকের আছে?! তাহলে এ বর্ণনায় কাকে তিনি যঈফ সাব্যস্ত করছেন– এই আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারকে না কি ইমাম মালেককে বা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে?

**(গ) মারফু বর্ণনা**

আর মারফু বর্ননা সম্পর্কে একই কথা, কে একে যঈফ বলেছেন এবং কেন বলেছেন?

ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন- হিশাম ইবনে হাস্‌সান- মুহাম্মদ ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমর রাযি. থেকে। এরা প্রত্যেকেই বুখারী মুসলিমের রাবী ও নির্ভরযোগ্য। এদের কাকে লেখক যঈফ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন এবং তা কিভাবে?

মুসনাদে আহমাদে বর্ণনাটি একাধিকবার এসেছে এবং কিতাবের মুহাক্কিক শায়খ শুআইব আরনাউত বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের রাবী। (দেখুন হা.নং.৪৮৪৭, ৪৯৯২) লেখক সাহেব শুআইব আরনাউতের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা বিভ্রান্তিকর। এর আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

১. হাফেয আলাউদ্দীন মারদীনী (মৃত্যু : ৭৫০হি.) বলেন, (وهذا السند على شرط الشيخين) বর্ণনাটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (আল-জাওহারুননাকী ৩/৩১)

২. হাফেয ইরাকী (মৃত্যু : ৮০৪ হি.) বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ (আল মুগনী আন হামলিল আসফার ১/৪১৩)

৩. মুহাদ্দিস যুরকানী (মৃত্যু : ১১৬২ হি.) ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। (শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা- ছালাতুননবী ফিল বিতরি অধ্যায়)

৪. মুহাদ্দিস আহমাদ গুমারী (মৃত্যু : ১৩৮০ হি.) বলেন, (هذا سند رجاله رجال الصحيح) এ সনদের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মানোত্তীর্ণ (বিদায়াতুল মুজতাহিদ লি-ইবনে রুশদ ৪/১৪২)

৫. আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষৌবী র. ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। (আত্তালিকুল মুমাজ্জাদ পৃ.১৪৭)

৬. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী (মত্যু : ১৪২১ হি.) (ছহীহুল জামেইস সগীর হা. ১৪৫৬/৩৮৩৪, ৬৭২০)

৭. লেখকের মতাদর্শী আহলে হাদীস আলেম আব্দুল্লাহ আল কাফী একই উদ্দেশ্যে প্রণীত 'ছহীহ সুন্নাহর আলোকে বিতর ছালাত' পুস্তকে (পৃ.৩২) বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে– **ছহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে...**

৮. শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের রাবী। (মুসনাদে আহমাদের টীকা : হা. ৪৮৪৭) অন্যত্র এ বর্ণনার মতন বিষয়ে শায়খের বক্তব্য সামনে আসছে।

এছাড়াও এর সমর্থনে আরো দুটি হাদীস আছে–
১. তিরমিযী হা.নং ৫৫২।
২. সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ২৭৩৮
(ঘ) লেখক শেষে বলেন, ‘তবে এর সনদ যঈফ’ মুহাদ্দিস শুআইব আরনাউত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।’ (পৃ. ৩৩০)
লেখক এখানে শায়খ শুআইব আরনাউত-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনটি সমস্যা সৃষ্টি করেছেন–
১. ‘তবে এর সনদ যঈফ’ কথাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য, কারো উদ্ধৃতি নয়।
২. শায়খ শুআইব-এর পূর্ণ বক্তব্য লেখক এখানে উল্লেখ করেননি। কেননা পূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরলে আসল তথ্য ফাঁস হয়ে যেতো। কারণ শায়খ শুআইব এর আগে বলেছেন (صحيح) অর্থাৎ ‘এ হাদীসটি সহীহ’। আর এর পরই বলেছেন–

وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

অর্থ : হারুন ইবনে ইবরাহীম আল-আহওয়াযী ব্যতীত এ সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও বুখারী মুসলিমের রাবী, তবে তিনি নাসায়ী শরীফের রাবী এবং তিনিও বিশ্বস্ত’। (হা.নং.৫৫৪৯)
৩. শায়খ শুআইব-এর এ বক্তব্যটি মূলত আলোচ্যে হাদীসের বিষয়ে নয়। বরং ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমরের ভিন্ন আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে। ভিন্ন হাদীস সম্পর্কে তোলা আপত্তিকে এ হাদীসে লাগিয়ে দিয়ে লেখক সাহেব শায়খ শুআইবের তাহকীকের অপব্যবহার করেছেন।

**শায়খ শুআইব- এর পূর্ণ বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যা**

লেখকের বক্তব্য– ‘মুহাদ্দিস শুআইব আরনাউত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।’ এর মানে কী? ‘ঐ’ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন বিষয়টি অস্পষ্ট? আসলে শায়খ শুআইব বলেছেন,

صحيح دون قوله : "صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل"، فقد سلف الحديثٍ عنه في الرواية (٤٨٤٧) بأنه رواه عدة موقوفا، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

অর্থ : (হাদীসটি মারফূরূপেই) সহীহ, শুধু এ কথাটি ব্যতীত যে, ‘মাগরিবের নামায দিনের বিতর, তোমরা রাতের নামাজকেও বিতর কর’। (কারণ) পূর্বে ৪৮৪৭ নং বর্ণনার (টীকায়) এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, একাধিকজন হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) ও বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। কেবল হারূন বিন ইবরাহীম ব্যতীত। তিনি সুনানে নাসায়ীর রাবী ও বিশ্বস্ত।’ (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং. ৫৫৪৯)
শায়খ শুআইবের বক্তব্য স্পষ্ট যে, তিনি হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেননি বরং সহীহ বলেছেন। বক্তব্য সম্পর্কে সহীহ নয় বলে মারফূরূপে (অর্থাৎ নবীজী স. এর বক্তব্যরূপে) বর্ণিত হওয়াকে সহীহ নয় বুঝিয়েছেন। মাওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যরূপে বর্ণিত হওয়া তার দৃষ্টিতেও সহীহ।
প্রিয় পাঠক! কেবল উদাহরণ হিসেবে এ কয়েকটি মাসআলার পর্যালোচনা পেশ করা হল। বস্তুত মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের বইটি এ জাতীয় বে-ইনসাফি, বাড়াবাড়ি ও ইলমী খেয়ানতে ভরপুর। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় প্রচলিত সালাতকে তিনি যে কোন মূল্যে জাল হাদীসের কবলে নিক্ষেপ করেই ছাড়বেন। কিন্তু মুযাফফার সাহেবের জেনে রাখা দরকার, সবকিছু শুধু ইচ্ছা করলেই হয় না। বাংলার আলেম সমাজ ঘুমিয়ে নেই; তারা আজ জনসাধারণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের সালাত পূর্বেও জাল হাদীসের কবলে ছিল না এখনো জাল হাদীসের কবলে নেই; তবে ইদানিং মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবদের কবলে পড়ে কারও কারও সালাত হয়তো জাল হয়ে যাচ্ছে!
কাজেই মজবুত আলেম না হলে এ জাতীয় বই পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অন্যথায় গোমরাহ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।
আল্লাহ তা‘আলা বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম উম্মাহকে এ জাতীয় যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাজত করেন। আমীন। ইয়া আরহামার রাহিমীন!

লেখক : শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, সদর যশোর।


# মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

**পাথর ও সিলেকশন বালু**

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

## পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

# সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৯

ফাতাওয়া মাসাইলের সাথে সম্পৃক্ততার ফলে অনেকের সাথেই কথা হয়। সরাসরি হয়, ফোনেও হয়; ফোনেই বেশি হয়। অনেক অজানা-অচেনা লোকের সাথেও কথা বলতে হয়। বারবার কথা হয়, তবুও পরিচয় জানার পর্ব আসে না। আর এক-দু'বার কথা হলে তো পরিচয়পর্বের প্রশ্নই আসে না। ফাতাওয়া-মাসাইলের সূত্র ধরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানা হয়ে যায় বিচিত্র মানুষের বৈচিত্রময় কাহিনী। বর্তমান সমাজে কত শ্রেণীর কত রুচির মানুষ যে বাস করে এবং কত ধরনের সমস্যায় যে মানুষ জর্জরিত সে অভিজ্ঞতা অন্যদের তুলনায় আমাদের হয়তো একটু বেশিই হয়।

গত সংখ্যায় সুখ সমাচারটি যাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল অনেক পাঠক তার ফোন নাম্বার জানতে চেয়েছিলেন। ফোন নাম্বারটি সরবরাহ করতে পারলে হয়তো তার প্রতি তারা সহযোগিতার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ফোন নাম্বারটি সংরক্ষণ করলে তার উপকার হতে পারে এ কথাটি কল্পনায়ও আসেনি। সুতরাং এখন তার জন্য দু'আ করা ছাড়া আর করার কিছুই নেই।

আজকের ঘটনাটিও ফোনের মাধ্যমে জানা। মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অজুহাতে সে যে কাহিনী শোনালো, তা বর্তমানে একেবারে বিরল নয়। সংসার তো নয়, যেন ছোটখাটো একটা জাহান্নাম। বিবাহের পূর্বে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। একে অপরকে ছাড়া বাঁচবে না। একজন আরেকজনকে না পেলে চিরকুমার থাকবে, তবুও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না– এমন হাজারো প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞার পর বিবাহ। মেয়েপক্ষ সামাজিক ও পারিবারিকভাবে অনেক নিম্নস্তরের। ছেলের জেদের কারণেই ছেলেপক্ষ এ বিয়েতে সম্মত হতে বাধ্য হয়। দাম্পত্যের শুরুটা ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে স্বামী কেন যেন অনাসক্তি ভাব দেখানো শুরু করেছে। দিন যত যায় ভাটার টান ততই গতি পায়। বেচারা মনে হয় হীনমন্যতার শিকার হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন কারো সাথেই এ আত্মীয়তা খাপ খাচ্ছে না। আগে বিষয়টা মনের মিলের কাছে হার মেনে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তার মন পরিবারের সাথে মানানসই কারো সঙ্গে মিল খোঁজার কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে। মনের ধর্মই এটা, যদি তার সাথে ইসলাম ধর্মের কঠিন সম্পর্ক না থাকে।

ফোনে এ কাহিনী যে বলেছে তার বর্ণনামতে ঘটনাটি তার বড় বোনের। বড় বোন পাশে থেকে ছোট বোনকে কথার যোগান দিচ্ছে– যা এপাশ থেকেও শোনা যাচ্ছিল। ছোট বোন বলছে, দুলাভাই খুব হাইপ্রোফাইল লোক। তাদের একটা সন্তানও আছে। বিয়ের পর আপু কিছুটা পর্দা শুরু করেছিলো। আপুর আশঙ্কা হলো, স্বামী বুঝি তার এ রক্ষণশীলতা ও শালীনতা পছন্দ করছে না। এ কারণে একপর্যায়ে সে তার শালীনতা ও নামকা-ওয়াস্তের পর্দাপ্রথা সব ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মডার্ন হয়ে গেল। কিন্তু ফায়দা কিছুই হচ্ছে না। একই খাটে শোয়া, একই টেবিলে খাওয়া, কিন্তু স্বামী তার প্রতি ভুলেও নজর করে না। এভাবে চলছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। স্ত্রীর প্রবল সন্দেহ, নিশ্চয় সে অন্য কাউকে পছন্দ করে। অন্যথায় এমন নারীবিমুখ হওয়া কোন পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তার স্বামীর পক্ষে তো আরো বেশি অসম্ভব। এদিকে এ উপেক্ষা ও বঞ্চনা স্ত্রীরও আর সহ্য হচ্ছে না। স্বামী হয়তো চায়, সে নিজে থেকেই চলে যাক। গায়ে পড়ে স্ত্রী ছাড়ার বদনাম কামাই করা তার ভদ্রতায় বাধে। কিন্তু স্ত্রী তো নিরুপায়, যাবে কোথায়? গেলে সন্তানসহ যেতে হবে। কেননা বাবা তো মনে হয় সন্তানটাকে তার সন্তানই মনে করে না। সন্তানের দিকে তাকালে স্ত্রীকেও দেখতে হয়, কাজেই সন্তানের দিকেও সে পিঠ দিয়ে রাখে। এ অবস্থায় মা-ই সন্তানের একমাত্র অবলম্বন। সবদিক ভেবে স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিল, সে প্রয়োজনে স্বামীর বিকল্প খুঁজে নিবে, কিন্তু নিজ থেকে এ স্বামীর সংসার ছেড়ে যাবে না। সে এখন উপযুক্ত কাউকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত। অতঃপর আকৃষ্টদের মাঝে বাছাইপর্ব। ফ্রি মাইন্ডের সমাজ। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড! কে আসে, কে যায়, কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়?– এসব নিয়ে মাইন্ড করার মত এখানে কেউ নেই। কাজেই স্বামীর গার্লফ্রেন্ডরা যেমন আসে স্ত্রীর সামনেই, স্ত্রীর বয়ফ্রেন্ডরাও আসে স্বামীর জ্ঞাতসারেই। এতে কারো মর্যাদা একটুও কমে না; বরং আরো বাড়ে। স্বামী বরং পারে তো নিঃসঙ্গ স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়ার কারণে তাদেরকে ধন্যবাদ দেয়। বাছাইপর্বে যার স্কোর সর্বাধিক তাকে মাঝে-মধ্যে স্ত্রী এখন নির্জনেও সময় দেয়। এতে কিছুটা হলেও সে স্বস্তি পায়। কিন্তু মনের মণিকোঠায় একটা অপরাধবোধ তাকে নতুন করে পীড়া দিতে থাকে যে, এভাবে চললে পরকালের কী হবে! আমার বুঝি একূল ওকূল দু'টোই বরবাদ হয়ে গেল। এই মর্মপীড়া যখন তীব্রতর হলো তখন সে ফিরে আসার পথ খুঁজতে লাগল এবং পূর্বের ন্যায় পর্দা শুরু করলো। বরং পূর্ণ পর্দা করতে লাগল। ফ্রেন্ডদের প্রতি অনীহা ও নিজেকে আড়াল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলতে লাগল। ফ্রেন্ডরা কেউ হাসে, কেউ অভিমান করে; সে সবকিছুই উপেক্ষা করতে চেষ্টা করে। সবচে' একান্ত বন্ধুটি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এখন একটি হিন্দু মেয়ের সাথে প্রেম করে। মাঝে-মধ্যে একে ফোন করে বলে, সে-ও নাকি হিন্দু হয়ে যাবে। একথা শুনে এরও খুব খারাপ লাগে। আর খারাপ লাগা থেকে আবার দুর্বলতা। একপর্যায়ে তাকে আবার কাছে আসার সুযোগ দেয়। সে-ও হিন্দুর প্রেম থেকে তওবা করে। হিন্দু হওয়ার চিন্তাও আপাতত বাদ। কিন্তু এবার সে-ই একমাত্র ফ্রেন্ড। আগের চেয়ে আরো

অন্তরঙ্গ, সুযোগ বুঝে বাসায় আসে। দু'জনে মিলে রান্না-বান্না করে, একই সাথে খায়-দায়। এখন মনে চায় পূর্বের ঠুনকো সংসার বাদ দিয়ে নতুন করে সংসার জুড়তে। এত ভালো মানুষ থাকতে আরেকজনের পিঠ দেখতে আর মন চায় না।

এ পর্যায়ে তার জিজ্ঞাসা হলো, আপু যদি তার বর্তমান স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহলে শরীয়ত মতে কোন অসুবিধা আছে কি না? এ যেন পায়খানা করার পরে দু'ফোটা রক্ত বের হলে উযূ ভাঙবে কি না এমন প্রশ্ন! বললাম, শরীয়ত মতে কোন্ কাজটা তিনি ঠিক করছেন? প্রথমে প্রেম করে বিবাহ করেছেন। এখন একজনের বিবাহে থেকে আরেকজনের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জুড়েছেন। এগুলোর কোনটাই তো শরীয়ত অনুমোদিত নয়। আপনার বোনের জীবনে এত অশান্তির মূল কারণ তো এগুলোই। শরীয়ত মতে বিবাহপূর্ব প্রেম বৈধ নয়। প্রেমের জের ধরে যে বিবাহ হয় তা শান্তিপূর্ণ হয় না এবং স্থায়ীও হয় না। প্রেমঘটিত বিবাহে স্বামী বা স্ত্রী কোন পক্ষই অপর পক্ষে কোন নতুনত্ব পায় না। যার ফলে যে কোন পক্ষই নতুনত্বের খোঁজে নামতে পারে। প্রেম করা এমন এক বাতিক, বিবাহের মাধ্যমে যার কোন চিকিৎসা হয় না। কাজেই প্রেমের বিয়েতে অশান্তি অনেকটা নিশ্চিত। এতে মানুষের দুনিয়া-আখেরাত দু'কূলই ধ্বংস হয়ে যায়।

সুতরাং আপনার বোনের প্রথম কাজ হলো, পরপুরুষের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, খাঁটি মনে আল্লাহর দরবারে তওবা করা। এরপর হয় ধৈর্য ধারণ করে এ সংসারে পড়ে থাকবে, অন্যথায় নিজের প্রতি ডিভোর্স নিয়ে এ স্বামীর বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সর্বাবস্থায় নিজেকে শতভাগ শরীয়ত মোতাবেক চালাতে চেষ্টা করবে। এতে চিরস্থায়ী পরকাল অন্তত ঠিক থাকবে। হয়তো বা এর ফলে ইহকালেও কোন দীনদার সঙ্গী মিলে যেতে পারে। আর না মিললেই বা কি, ইহকাল তো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী; এখানকার সুখ-দুঃখও তো একদম অস্থায়ী।

এসব বলার পরও বড় বোন পাশ থেকে বলে যাচ্ছিল, দ্বিতীয় পুরুষটাকেই বিবাহ করা যাবে কি না– এটা স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করো। তুমি তো আমার বিষয়টা ক্লিয়ার করে বলতে পারছো না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তখন সে বললো, আপু বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করতে চান। কারণ আপু তাকে অনেক বেশি ভালোবাসে আর সে-ও আপুকে খুব ভালোবাসে। আমি বললাম, দেখুন! নাজায়েয পন্থা আপাতঃদৃষ্টে একটু বেশিই ভালো লাগে। কিন্তু মনে রাখবেন, হারামে কোনদিন আরাম হয় না। এ বলে আমি কথা শেষ করতে চাইলে সালাম দিয়ে সে-ও কথা সমাপ্ত করলো।

আবূ তামীম


বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

## 'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

# বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন ২০১৮

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

**২৪ মার্চ ২০১৮ শনিবার  সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত**

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে

কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে। দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

# ফাতাওয়া-মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

**মুহাম্মাদ আবূ মু'আবিয়া**
**মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**২৬৭ প্রশ্ন : (ক)** ফজরের ফরয নামাযে সুন্নাত কিরাআত পাঠ করার সহীহ তরীকা কি?

**(খ)** কেউ যদি ফরয নামাযের প্রথম রাকআতে কোন সূরার শুরু থেকে অথবা সূরার মধ্যখান থেকে তিলাওয়াত করে এবং তা শেষ না করে দ্বিতীয় রাকআতে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করে তাহলে এটা সুন্নাত পরিপন্থী হবে কি না?

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

**উত্তর : (ক)** ফজরের ফরয নামাযে সুন্নাত কিরাআত নামাযী ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে-

(১) মুকীম ব্যক্তি ইমামতি করলে সে ফজরের ফরয নামাযে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করবে। অথবা তিওয়ালে মুফাস্সাল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত) এর মধ্য হতে কোন সূরা পাঠ করবে।

(২) মুকীম ব্যক্তি মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) হলে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা তিলাওয়াত পারবে।

(৩) নামাযী ব্যক্তি মুসাফির; তবে সে তার গন্তব্যে পৌঁছেছে এবং সে নিরাপদ ও স্থির হয়েছে তাহলে সে আওসাতে মুফাস্সাল (সূরা বুরূজ থেকে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত) এর মধ্য হতে যে সূরাগুলো বড় সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটি তিলাওয়াত করে নিবে।

(৪) নামাযী ব্যক্তি মুসাফির এবং তার সফর অব্যাহত রয়েছে অর্থাৎ সে তার গন্তব্যে পৌঁছেনি, এক্ষেত্রে সে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবে। (সূরা মুযযাম্মিল- ২০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৫৮, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৯৫২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৭, ফাতাওয়া শামী ১/৫৪০, ৫৪১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬১, কিতাবুন নাওয়াযিল ৩/৫২০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১৬৯)

**(খ)** ফরয নামাযে সুন্নাত কিরাআতের পদ্ধতি হল, প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ফজর ও যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাস্সাল, আসর ও ইশার নামাযে আওসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্সাল থেকে পৃথক পৃথক দু'টি সূরা তিলাওয়াত করা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকআতে পঠিত সূরাটি প্রথম রাকআতে পঠিত সূরার পূর্ববর্তী না হওয়া।

অতএব-

(১) কেউ যদি বিনা কারণে প্রথম রাকআতে কোন সূরার শুরু থেকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে অন্য সূরার শুরু থেকে তিলাওয়াত করে

(২) অথবা প্রথম রাকআতে কোন সূরার মধ্যখান থেকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে অন্য সূরার মধ্যখান থেকে তিলাওয়াত করে

(৩) অথবা প্রথম রাকআতে কোন সূরার শেষাংশ থেকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে অন্য সূরার শেষাংশ থেকে তিলাওয়াত করে

(৪) অথবা প্রথম রাকআতে কোন সূরার শেষাংশ থেকে এবং দ্বিতীয় রাকআতে অন্য সূরার শুরু অংশ অথবা অন্য কোন ছোট সূরা তিলাওয়াত করে– যেমন প্রথম রাকআতে امن الرسول بما انزل এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে

(৫) অথবা দুই রাকআতে পৃথক পৃথক দু'টি সূরা তিলাওয়াত না করে একটি ছোট সূরাকে ভাগ করে দুই রাকআতে তিলাওয়াত করে- তাহলে এ পাঁচ সূরতে তিলাওয়াত অনুত্তম হবে; তবে নামায মাকরূহ হবে না।

(৬) আর যদি প্রথম রাকআতে একটি সূরা এবং দ্বিতীয় রাকআতে অথবা ঐ রাকআতেই ইচ্ছাপূর্বক তার পূর্ববর্তী কোন সূরা তিলাওয়াত করে

(৭) অথবা প্রথম রাকআতে কোন সূরা তিলাওয়াত করার ইচ্ছা করে কিন্তু ভুলবশত অন্য সূরার এক বা দুই আয়াত তিলাওয়াত করে ফেলে অতঃপর পূর্বের ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় আগের সূরা শুরু করে, তাহলে এই দুই সূরতে তিলাওয়াত তো সুন্নাত পরিপন্থী হবেই; নামাযও মাকরূহ হবে। (ফাতাওয়া শামী ১/৫৩৯, ৫৪৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬১, ৬৬, ৬৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৮)

**জাওয়াদ নাহিয়ান**
**কুড়িল বিশ্বরোড, ঢাকা**

**২৬৮ প্রশ্ন : (ক)** আমি শুনেছি যে, সুর দিয়ে কবিতা আকারে দু'আ করা মাকরূহ, কথাটি সহীহ কিনা? দাঁড়িয়ে দু'আ করা কি শরীয়ত সম্মত? এটা কি আদবের পরিপন্থী? দু'আ বসে করা উত্তম, নাকি দাঁড়িয়ে? নিঃশব্দে, নাকি সশব্দে?

**(খ)** কারো আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুবরণ করার পর তার বাড়িতে দু'আ করিয়ে যে খাবারের আয়োজন করা হয় তা খাওয়ার হুকুম কী? এতে কি মেহমানদারীর সওয়াব পাওয়া যায়?

**উত্তর : (ক)** পূর্ব থেকে কবিতা আকারে বানানো দু'আ একনিষ্ঠভাবে করা জায়েয আছে যদি কোন লৌকিকতা না থাকে; একে মাকরূহ বলা সহীহ নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বভাবজাতভাবে নির্গত ছন্দবদ্ধ বাক্য দ্বারা দু'আ করেছেন।

اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، اغفر للانصار والمهاجرة.

অর্থ : হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই মূলত জীবন, মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪১৪)

তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের বানানো কবিতা আকারে দু'আ হয় অথবা লৌকিকতা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এভাবে দু'আ করা নিষেধ।

দু'আ দাঁড়িয়ে, বসে উভয় অবস্থায় করা যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বসে করা উত্তম। বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে করা যায়, যেমন কাবা শরীফ প্রথম বার নজরে আসার পর দু'আ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দু'আ করা।

ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে যদি দু'আ সম্মিলিতভাবে হয় এবং কারো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সশব্দে দু'আ করাও জায়েয আছে। (সূরা আ'রাফ- ২০৫, আহকামুল কুরআন ৪/২০৮, উমদাতুল কারী ২২/২৯৮,

ফাতহুল বারী ৬/১৩৫, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৭/৩০১৬)

(খ) কারো আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুবরণ করার পর তার বাড়িতে কুরআন পড়ে দু'আ করিয়ে যে খাবারের আয়োজন করা হয় তা মাকরূহ এবং বিদ'আতী কাজ; যা পরিহার করা আবশ্যক। কেননা খানার দাওয়াতের অনুষ্ঠানকে আনন্দদায়ক কোন বিষয়ে বৈধতা দেয়া হয়েছে, কোন দুঃখ বা শোকের ক্ষেত্রে বৈধ করা হয়নি। আর যেহেতু এই সমস্ত খাবার-দাবার সাধারণত লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে, তাই এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

যদি মেহমানদারীর নিয়তে খাওয়ানো হয় তাহলে মেহমানদারীর সওয়াব হবে এবং ঐ সওয়াবও মৃত ব্যক্তির জন্য পৌঁছানো যাবে। (ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩, শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ; পৃষ্ঠা ১১৬, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাফাতীহ ৯/৩৮৩২, ফাতাওয়া শামী ২/২৪০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১/৫৮৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১০০)

**উবাইদুল্লাহ**
**কুমিল্লা**

**২৬৯ প্রশ্ন : (ক)** বর্তমানে আমাদের দেশে এক ধরনের ব্যবসা চালু আছে। সেটা হল, এক ব্যক্তি বিদেশে থাকে। সে যখন পরিবারের কাছে টাকা পাঠায় তখন বিদেশী মুদ্রা ঐ দেশের এক ব্যক্তির কাছে দেয়। কয়েকদিন পর ঐ বিদেশী ব্যক্তির নিজস্ব লোক যে বাংলাদেশে থাকে, সে তার পরিবারের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়। আমার জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিটা হুন্ডি ব্যবসা কি না? আর হুন্ডি হলে তা জায়েয হবে কি না?

(খ) জনৈক ব্যক্তি বিদেশ থেকে জাহাজে মালামাল নিয়ে আসে। জাহাজ ঘাটে পৌঁছার আগেই অনলাইন বা অন্য কোন মাধ্যমে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। সে আবার অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই ব্যবসা জায়েয আছে কি না?

(গ) আমরা বিদেশ থেকে ফোনের মাধ্যমে বাকিতে স্বর্ণ ক্রয় করি। সেগুলো বিক্রয় করে টাকা পরিশোধ করে দিই। আমাদের এ ব্যবসা জায়েয আছে কি না? জানালে উপকৃত হবো।

**তানকীহ :** (১) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় স্বর্ণ কোথায় থাকে?

(২) আদান-প্রদান কিভাবে হয়?

(৩) দ্বিতীয়বার কখন ঐ স্বর্ণ বিক্রয় করা হয়?

**জওয়াবে তানকীহ :** (১) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় স্বর্ণ বিক্রেতার কাছে থাকে। চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর বিক্রেতা আমাদের লোকের নিকট বুঝিয়ে দেয় । তারপর বিক্রেতার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। দেশে আনা, এয়ারপোর্ট থেকে বের করা ইত্যাদি সব দায়িত্ব আমাদের।

(২) স্বর্ণ বিদেশে থাকা অবস্থায় আমাদের নিজস্ব লোকের নিকট বিক্রেতা স্বর্ণ বুঝিয়ে দেয়।

(৩) দেশে আনার পর আমরা তা বিক্রি করে মূল্য পরিশোধ করি।

**উত্তর (ক)** প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিটি হুন্ডির আওতায় পড়ে। আর শরীয়ত মতে তা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো,

(১) বিদেশী মুদ্রার ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রদান করতে হবে।

(২) কোন এক পক্ষের মুদ্রা চুক্তির মজলিসেই অন্য পক্ষকে হস্তান্তর করতে হবে।

শর্ত সাপেক্ষে এ লেনদেন শরীয়ত মতে জায়েয হলেও রাষ্ট্রীয় আইনে এভাবে টাকা পাঠানো নিষিদ্ধ। কাজেই আইনগতভাবে পাকড়াও হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এমন লেনদেন থেকে বিরত থাকা উচিত। (ফাতাওয়া শামী ৫/১৭৯, ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসাইল ২/৮২-৮৭)

(খ) প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা জায়েয হবে না। হাদীসে নববীতে পণ্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কোন পণ্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করো না'। (সূরা হাশর- ৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ২১৩৫, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১১/৩৬, জাদীদ তিজারাতী শিকলেঁ; পৃষ্ঠা ১৯)

(গ) বাকিতে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় অধিকাংশ উলামায়ে হিন্দের নিকট জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, যে মজলিসে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হচ্ছে উক্ত মজলিসেই স্বর্ণ হস্তগত করা। সুতরাং প্রশ্নোক্ত সূরতে যেহেতু আপনার নির্ধারিত প্রতিনিধি চুক্তি সম্পাদনের মজলিসেই স্বর্ণ হস্তগত করে, তাই এ ব্যবসা জায়েয হবে।

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রেও নিজের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের অনুসরণ করা কর্তব্য। (ফাতাওয়া শামী ৫/২৫৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ফী ফিকহিন নু'মানী ৭/১৭১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/২১৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৯০-৯১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/১২৪, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১৯/৫৭৭)

**মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**
**ফরিদপুর সদর**

**২৭০ প্রশ্ন :** সরকারের নিকট থেকে গরুর হাট ইজারা নিয়ে যে ব্যক্তি ক্রেতাদের নিকট থেকে হাসিল গ্রহণ করে, তার এ কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? অবৈধ হলে তার হাসিল বাবদ উসূলকৃত উপার্জন হালাল হবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** পশুহাটে ইজারাদার কর্তৃক যে হাসিল উসূল করা হয় তা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। কেননা ইজারাদার যদি হাটের মধ্যে কোন সেবা দিয়েও থাকে তবে তাতে মূলত উপকৃত হয় পশু বিক্রেতারা। তাই তাদের উচিত ছিল বিক্রেতার কাছ থেকে হাসিল উসূল করা। কারণ বিক্রেতা ইজারাদারের যে সুবিধা ভোগ করেছে ক্রেতা তা ভোগ করেনি।

অতএব ইজারাদার কর্তৃক বিক্রেতার কাছ থেকে হাসিল উসূল করা যৌক্তিক; ক্রেতার কাছ থেকে নয়।

সুতরাং হাসিল বাবদ উসূলকৃত উপার্জন হালাল হবে না। কেননা ক্রেতাগণ তা বাধ্য হয়ে দিয়ে থাকেন। অতএব এর মধ্যে হারামভাবে উপার্জিত সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। (সূরা নিসা- ২৯, ফাতাওয়া শামী ৬/৫, ফিকহুল মু'আমালাত ১/৯৪, বাদায়িউস সানায়ে ৪/১৯৫, শরহুল মাজাল্লা ২/৫৩১)

**এ.এন.এম আমীন**
**বাঙ্গাখাঁ, লক্ষ্মীপুর**

**২৭১ প্রশ্ন : (ক)** জি.পি ফান্ডের টাকায় সুদ হবে না বলে মাসিক মদীনা পত্রিকায় প্রকাশ করে, যদি কেউ বেশি লাভ নেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা জমা দেয় ও সে টাকার লাভ নেয় তাহলে সেটাও সুদ হবে না বলে ঐ পত্রিকায় ফতওয়া দেয়।

'জি.পি ফান্ডের টাকায় সুদ হবে না' তার ব্যাখ্যায় লিখেছে যে, (১) সরকার শুধুমাত্র চাকুরীজীবিদের জন্য উক্ত ফান্ডে টাকার রাখার সুযোগ দিয়েছে। যেমন সরকার তাদেরকে বাসা ভাড়া, টিফিন ভাতা, যাতায়াত ভাতা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। জি.পি ফান্ডে টাকা জমা রাখাও সরকারের এইরূপ একটি সুযোগ।

(২) চাকুরীজীবিদেরকে নির্দিষ্ট অংকের (১০%) টাকা অবশ্যই জমা দিতে হবে, অন্যথায় সে বেতন পাবে না।

(৩) অন্য কেউ এ ফান্ডে টাকা জমা রাখতে পারে না।

কোন ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় ২০১২ সালে জি.পি ফান্ডে টাকা জমা বন্ধ করে দিয়ে সরকারের নীতিমালা অনুযারী ২০১৩ সালে জমাকৃত টাকার লাভসহ ৮০% টাকা উঠায়। পরবর্তী বছর অবশিষ্ট ২০% টাকার লাভসহ আরো ৮০% টাকা উঠায়। ২০১৫ সালে চাকুরী শেষ করে অবশিষ্ট টাকা (লাভসহ) উঠায়।

এখন প্রশ্ন হল, ২০১৫ সালে যে টাকা উঠানো হয়েছে তা সুদ হবে কি না? যেহেতু দুই বছর আগে ২০১২ সালে টাকা জমা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আগের জমাকৃত টাকা থাকলেও সামান্য পরিমাণ ছিল, তাই এ টাকা হালাল হবে কি না?

(খ) দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেয়ার পূর্বে মালিক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স গ্রহণ করে থাকে, এ টাকার উপর কি যাকাত ওয়াজিব হবে? যদি ওয়াজিব হয় তাহলে কার উপর, মালিকের নাকি ভাড়াটিয়ার উপর?

**উত্তর :** (ক) সরকারি চাকুরীর বেতনের যে অংশ প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখা হয় এবং চাকুরী শেষে বাড়তি অংশসহ দেয়া হয়, তাকে সরকারি পরিভাষায় সুদ বলা হলেও শরীয়তের পরিভাষায় তা সুদের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। সুতরাং তা হালাল হিসেবেই বিবেচ্য হবে।

কিন্তু বাধ্যতামূলক যত টাকা কাটবে, চাকুরীজীবির পক্ষ থেকে তার চেয়ে বেশি টাকা কাটাবে না। কাটালে সে অংশে চাকুরীজীবির বেতন হতে কর্তিত টাকার পরিমাণ চাকুরীজীবির জন্য হালাল হবে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে যুক্ত করা অতিরিক্ত অর্থ ও সুদ হিসেবে বর্ধিত অংশে সুদের প্রবল সন্দেহ থাকায় তা হালাল হবে না। সে অংশ উঠিয়ে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবদের মাঝে দান করে দিতে হবে এবং সতর্কতামূলক চাকুরীজীবির স্বেচ্ছায় জমাকৃত অংশের যাকাতও প্রদান করতে হবে, যদি যাকাতের শর্তাবলী তাতে বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে চাকুরী শেষ করে ২০১৫ সালে যে পরিমাণ টাকা উঠানো হয়েছে তা সুদ হবে না। যদি উক্ত ফান্ড সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক কর্তিত টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জমানো না হয়ে থাকে। যদিও দুই বছর পূর্বে টাকা জমা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩০৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৪৯, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩০৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৪৬২)

(খ) বর্তমানে আমাদের দেশে দোকান, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতিতে অ্যাডভান্স টাকা আদান-প্রদান হয়ে থাকে-

এক. অফেরতযোগ্য, যা চুক্তি অনুযায়ী মাসে মাসে নির্ধারিত পরিমাণ ভাড়া উক্ত অগ্রীম টাকা থেকে দোকানের মালিক কেটে নিয়ে থাকে। এর বিধান হলো, দোকানের মালিক উক্ত টাকা গ্রহণ করার পর সে পূর্ণ মালিক হয়ে যায়। তাই মালিক নিজস্ব কাজে উক্ত টাকা খরচ করতে পারবে এবং বছরান্তে এ টাকা অবশিষ্ট থাকলে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ঐ মালিকের উপর এ টাকারও যাকাত আসবে।

দুই. ফেরতযোগ্য, যা ভাড়া হিসেবে কেটে নেয়া হয় না; বরং দোকানের মালিকের নিকট জামানত হিসেবে থাকে এবং চুক্তি শেষে উক্ত টাকা ভাড়াটিয়াকে ফেরত দিতে হয়। অ্যাডভান্সদাতা তথা ভাড়াটিয়াই এ টাকার পূর্ণ মালিক হয়ে থাকে। তাই এ টাকার যাকাত ভাড়াটিয়ার উপরে আসবে এবং এ টাকা হস্তগত হওয়ার পর পূর্বে এর যাকাত না দিয়ে থাকলে বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। (সূরা বাকারা- ২৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৯৭, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৪৬, আল-মাবসূত ২/১৯৬, বাদায়িউস সানায়ে ২/৯, ২০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৩৯, ফাতহুল কাদীর ২/১২১, ফাতাওয়া শামী ২/২৬১, জাদীদ ফিকহী মাবাহিস ৬/২০, জাদীদ ফিকহী মাসাইল; পৃষ্ঠা ২১৭-২১৯)

**আবূ মু'আবিয়া**
**মুহাম্মাদপুর, ঢাকা**

**২৭২ প্রশ্ন :** (ক) জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে ৩০০০/- টাকা ঋণ নিল। এক মাস পর সে আমাকে ফোনে বলল, আপনার টাকাগুলো আপনার বিকাশ নাম্বারে পাঠিয়ে দিব। আমি অনুমতি দিলাম। কথা অনুযায়ী সে ৬০/- টাকা খরচসহ টাকাগুলো পাঠিয়ে দিল। আমি ক্যাশ আউট না করে উক্ত টাকা অন্যভাবে খরচ করেছি।

জানার বিষয় হল, ক্যাশ আউটের খরচ বাবদ সে যে ৬০/- টাকা অতিরিক্ত দিয়েছিল ক্যাশ আউট না করায় তা লাগেনি। এখন এই ৬০/- টাকার মালিক কে হবে, আমি নাকি সে?

(খ) অনেক লোডের দোকানে লেখা থাকে, ৩০/- টাকার নিচে লোড করলে ১/- টাকা বেশি দিতে হবে। অনুরূপ রিচার্জ কার্ডের দাম লেখা থাকে ৯/- টাকা; কিন্তু কিনতে হয় ১০/- টাকা দিয়ে। এ অতিরিক্ত টাকা নেয়া দোকানদারের জন্য জায়েয হবে কি?

(গ) আমাদের দেশে অনেকে রিক্সা, সি.এন.জি ইত্যাদি দৈনিক ভাড়া নিয়ে চালায়। যে ভাড়া নিল সে গাড়ি দিয়ে কোন উপার্জন করুক বা না করুক দৈনিক নির্ধারিত ভাড়া মালিকপক্ষকে দিতে হয়। এভাবে চুক্তি করলে কোন সমস্যা আছে কি না?

(ঘ) জীব-জন্তুর খেলনা যেমন মাটির বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি এবং প্লাস্টিকের তৈরি পুতুল বা কাপড়ের তৈরি পুতুল ইত্যাদি দিয়ে বাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারবে কি না? 'হযরত আয়েশা রাযি. পুতুল দিয়ে খেলেছেন' কথাটির বাস্তবতা কি?

**উত্তর :** (ক) বিকাশে টাকা পাঠানোর খরচ ঋণগ্রহীতার উপর বর্তাবে। আর প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী খরচ বাবদ ৬০/- টাকা যেহেতু খরচ হয়নি, কাজেই এ টাকার মালিক ঋণগ্রহীতাই হবে। আপনি তাকে জানিয়ে দিবেন যে, এ টাকা ক্যাশ উত্তোলন না করায় ব্যবহৃত হয়নি। জানার পর যদি সে ফেরত নিতে চায় তাহলে ফেরত দিয়ে দিবেন। আর আপনাকে হাদিয়া করতে চাইলে আপনিও ব্যবহার করতে পারবেন। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৬৫)

(খ) ফ্লেক্সি লোডের এজেন্টরা কোম্পানির চাকুরীজীবি নয়; বরং তারা স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী। সুতরাং রিচার্জকারী দোকানদারের জন্য সেবা বিক্রি করে অতিরিক্ত ১/- টাকা নেয়া জায়েয আছে। (সূরা বাকারা- ২৭৫)

(গ) এভাবে চুক্তি করলে কোন সমস্যা নেই; এটা শরীয়তসম্মত পন্থা। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা ইজারা বা ভাড়া চুক্তি। আর ইজারা চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভাড়া নির্ধারিত থাকা জরুরী। নতুবা এ চুক্তি সহীহ হবে না। চাই ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তির লাভ হোক বা না হোক। (আল-লুবাব ফী শরহিল কিতাব ৩/২১৪)

(ঘ) প্রাণীর স্পষ্ট অবয়ববিশিষ্ট খেলনা বা পুতুল ক্রয়-বিক্রয় করা ও তা দ্বারা খেলাধুলা করা জায়েয নেই। হযরত আয়েশা রাযি. পুতুল দিয়ে খেলেছেন, কিন্তু তা ছিল হাতে বানানো তুচ্ছ ও কাপড়ের। তাতে চোখ, কান, নাক ইত্যাদি স্পষ্ট থাকার কোন প্রমাণ নেই। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২২৩৬, ৬১৩০, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৩১৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২০১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/৩০৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৬৫)

## নূরানী মকতবসহ সকল উস্তাদের সঙ্গে

# আজীবন যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরী

**মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক**

**এক.**

প্রবাদ আছে, 'ইলম সীনা বা-সীনা।' অর্থাৎ ইলম উস্তাদের অন্তর থেকে শাগরেদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শিক্ষা হল, তালিবুল ইলমের ফযীলত লাভ করতে হলে মৃত্যু পর্যন্ত তালিবুল ইলম হয়ে থাকতে হবে।

তো 'সীনা বা-সীনা' এবং 'মৃত্যু পর্যন্ত' কথা দু'টির সমন্বয়ে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হল, সত্যিকারার্থে তালিবুল ইলম হওয়ার জন্য এবং ইলম দ্বারা যথাযথ উপকৃত হওয়ার জন্য উস্তাদ-শাগরেদের সীনা দু'টির মধ্যে আজীবন অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকা জরুরী; শিক্ষাকালীনও এবং শিক্ষা সমাপনের পরেও। কুরআনে কারীমের নির্দেশ– 'তোমরা সাদেকীনের সাহচর্য অবলম্বন কর'-এর আলোকে আমরা এ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে সোহবত, সাহচর্য এবং যোগাযোগরক্ষা নামেও অভিহিত করতে পারি।

**প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকালীন সোহবত ও যোগাযোগ**

বর্তমান ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী একজন তালিবুল ইলমকে শিশুকালেই মাদরাসায় ভর্তি হতে হয় এবং সেখানে দিন-রাত অবস্থান করে ইলম হাসিল করতে হয়। এ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল, নিয়মিত অবস্থানের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে উস্তাদের সোহবত ও সান্নিধ্য হাসিল করা। একজন তালিবুল ইলম মকতবে পড়াশোনাকালীন প্রচুর পরিমাণে উস্তাদের সোহবত উঠায়। দিন-রাতের প্রায় অধিকাংশ সময়ই সে তার উস্তাদের সোহবত থেকে অর্জন করতে থাকে। ফলে মাত্র দু'বছরে (কেউ কেউ এরও কমে) পুরো কুরআন শরীফ নাযেরা পড়ে নেয় এবং শত শত দু'আ-দুরূদ ও মাসআলা-মাসাইল শিখে ফেলে। এমনকি পুরো যিন্দেগী ইসলামী ছাঁচে চালানোর জন্য এখান থেকে সে এক মাইলফলক অর্জন করতে পারে।

এরপর সে যখন হিফয বিভাগে যায় তখন আরো বেশি পরিমাণে উস্তাদের সোহবত উঠায়। এই নাবালেগ তালিবুল ইলম শেষ রাত্রে তার আরামের বিছানা ছেড়ে দেয়। শেষ রাতের এ সময়টি এতই মূল্যবান যে, স্বয়ং রাব্বুল আলামীন বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন। এ সময় যখন বহু বয়স্ক ব্যক্তিও ঘুমে বিভোর থাকে তখন এই ছোট্ট তালিবুল ইলম আল্লাহর সুমহান কালামে পাক তিলাওয়াত করে। এভাবে তিন/চার বছরে সে তাজবীদসহ পুরো কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলে। আল্লাহু আকবার!

মনে রাখার বিষয়, এ পাঁচ-ছয় বছরে তার উস্তাদ যে শ্রম ও মেধা তার পেছনে ব্যয় করেছেন, তার তুলনা হয় না। এ সময় এই মকতব-হিফযের উস্তাদগণই হন তার পীর ও মুরশিদ। এদিকে বেশিরভাগ তালিবুল ইলম এ পর্যায়ে তার জীবনের দ্বিতীয় ধাপে (তথা বালেগ হওয়ার বয়সে) পদার্পণ করে। এ ধাপটি যে কোন মানুষের জন্যই বড় নাযুক ও সংবেদনশীল। বলাবাহুল্য এ সময় সোহবতের হক যথাযথ আদায় হলে জীবনের নতুন পর্বের সূচনালগ্ন থেকেই একজন তালিবুল ইলম নিরাপদে নিরুপদ্রবে তার অভীষ্ট লক্ষ্য জান্নাত পানে এগিয়ে যেতে থাকবে। শয়তান তাকে তার পথ থেকে থাবা মেরে ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং সে আধুনিক যন্ত্র-মন্ত্রের কবলেও পড়বে না।

হিফযখানার পর যখন সে কিতাব বিভাগে আসে তখন শুরু হয় তার শিক্ষাজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ স্তরে সে আরবী-বাংলা-উর্দূ-ফারসী ভাষায় কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করে। আরও শিক্ষা করে এ তিনটির তরজমা, তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অবশ্য এগুলোরও আগে তাকে শিখতে হয় নাহব, সরফ, বালাগাত, মানতেক, মা'আনী, বায়ান, বাদী'সহ সমস্ত সহায়ক ইলম।

কিন্তু এটা যেহেতু তার যৌবনের সূচনা, এজন্য যৌবনের উত্তাপে সে উস্তাদের সোহবতকে জরুরী মনে করে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষ বোঝা মনে করে। উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা তার কাছে কঠিন মনে হয়। উস্তাদকে ফাঁকি দিতে পারলেই সে বাঁচে।

বস্তুত উস্তাদের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ্য করে তোলার এটাই সময়। এ সময় সে উস্তাদের সাহচর্য ও সঙ্গ অবলম্বন করে জেনে নিবে পথের দিশা, অর্জন করবে আলোকশিখা, শিখবে আমল, গড়বে আখলাক, গ্রহণ করবে চিন্তা-চেতনা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণকালে তালিবুল ইলমের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে কিতাবী যোগ্যতা হাসিল করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য উস্তাদ ও তা'লীমী মুরুব্বীর সাহচর্য অবলম্বনের এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার কোন বিকল্প নেই।

তিক্ত হলেও সত্য, আজকালের অধিকাংশ তালিবুল ইলম এ দিকে কোন মনোযোগ দেয় না এমনকি এর প্রয়োজনও বোধ করে না। সে তো আজ এই কবিতার প্রয়োগক্ষেত্র–

شاگرد ایں زمانہ وقت سبق یگانہ،

چوں شد سبق میسر آرند صد بہانہ۔

বরং একটু আগে বেড়ে বললে ভুল হবে না যে, এখন তালিবুল ইলম দরস চলাকালীনও উস্তাদের সঙ্গে 'য়্যাগানা' বা আপন হতে পারে না। এ যুগের তালিবুল ইলম মুতালা'আ করে না, সবক ধরে না, বোঝে না; বোঝার চেষ্টাও করে না। সে দরসে বসে ঘুমায়। এমনকি কখনও পুরো দরসটাই ফাঁকি দিয়ে দেয়।

তালিবুল ইলমের চিন্তা– সে বক্তা হবে, আরবী ভাষার আদীব হবে, ইংরেজিতে পারদর্শী হবে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখবে, যুগসচেতন হবে, আরও কত কি! সে সবই হতে চায় কিন্তু কিতাবী ইস্তি'দাদ ও ইলমী যোগ্যতা অর্জনের জন্য তার হাতে সময় নেই!

অতঃপর এই তালিবুল ইলমের অভিযোগ হল– কিতাব বুঝি না, আরবী পারি না, নাহবে কাঁচা, সরফ মাথায় ঢোকে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঠিক আছে, তুমি পারো না, তুমি বোঝো না; এটা হতেই পারে। কিন্তু পারা ও বোঝার জন্য তুমি কী পদক্ষেপ নিয়েছো? আদৌ কি তোমার কোন তা'লীমী মুরুব্বী বা পরামর্শদাতা আছে? কোন উস্তাদের সঙ্গে কি এ উদ্দেশ্যে সম্পর্ক গড়েছো এবং তার সঙ্গে কখনও এ নিয়ে আলোচনা করেছো?

তুমি তো যৌবনের উত্তাপে নিজেকেই বড় মনে করছো, কারও সোহবত-সাহচর্য ও পরামর্শের তোয়াক্কা করছো না!

বাস্তবতা হল, এখন তালিবুল ইলমরা উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করে না। তারা ইট-পাথর আর দেয়াল-মাটির সাহচর্যে দশ/বারো বছর কাটিয়ে 'ফারেগ' হয়ে যায়। বলো না, মাটির কী ক্ষমতা আছে কাউকে নাহব-সরফ বা আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়ার?!

প্রিয় তালিবুল ইলম! তুমি ইরাদা করো এবং প্রত্যয়ী হও যে, আমি কিছু একটা হবোই হবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য কামনা করে যে যে বিষয়ে তোমার দুর্বলতা আছে, সে সব বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উস্তাদের শরণাপন্ন হও; তাকে তোমার মুরুব্বী বানাও, তার পরামর্শ মোতাবেক চল, তার চিন্তা-চেতনা ও আমল-আখলাক থেকে শেখো আর শেখো। আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলি, আমি নিশ্চিত, এটা করতে পারলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হে তালিবুল ইলম! উস্তাদের সোহবত হাসিলের তোমার সময় হয় না; কিন্তু অন্য কিছুর সোহবত তো তুমি ঠিকই হাসিল কর! উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে কি হয়েছে, তোমার তো ইন্টারনেট, ফেসবুক, যন্ত্র-মন্ত্র আর খেলাধুলার সঙ্গে ঠিকই সম্পর্ক আছে! তুমি কি ভেবেছো, সোহবত-বিহীন এই ভবঘুরে জীবন তোমার চিরকালই আনন্দে কাটবে? কক্ষণও নয়; শীঘ্রই তোমার এ আনন্দ বিষাদে পরিণত হবে। হে প্রিয়! বিলম্ব না করে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কল্যাণকামী হও।

**শিক্ষা-পরবর্তী সোহবত ও যোগাযোগ**

নিবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে, তালিবুল ইলমের ফযীলত লাভ করতে হলে মৃত্যু পর্যন্ত তালিবুল ইলম হয়ে থাকতে হবে। তা সত্ত্বেও যারা প্রথাগত ফারাগাত হাসিল করেছি তাদের জন্য উস্তাদদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা আরো বেশি দরকার। কেননা শিক্ষা গ্রহণকালীন মাদরাসার অভ্যন্তরে অবস্থানের সুবাদে এবং উস্তাদদের আম-নেগরানীর ফলে এমনিতেই অনেক ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যায়। পক্ষান্তরে ফারাগাতের পর একজন ফাযেল সম্পূর্ণরূপে নেগরানীমুক্ত হয়ে বিলকুল একা হয়ে যায়। এদিকে শয়তান তো ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য সবখানে সদলবলে ওঁৎ পেতে বসে আছে। সে যে কখন কাকে কোন দিক থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, উস্তাদ-মুরুব্বীর সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ না থাকলে টেরও পাওয়া যাবে না। এর দু'-চারটা দৃষ্টান্ত সবারই জানা আছে।

বর্তমানে দীনী খিদমতের ময়দানগুলো দিনকে দিন আরও কঠিন, জটিল ও পিচ্ছিল হয়ে উঠছে। প্রথাগত ফারাগাতের পর কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করে কদমে কদমে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে; বরং খেতেই হয়। সেই নাযুক সময়ে উস্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও তার পরামর্শ একজন ফাযেলকে কল্পনাতীত উপকার পৌঁছাবে। এ ব্যাপারে অনেক ফাযেলের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং উস্তাদদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে দ্রুত তৈরি করে নেই, আর থাকলে আরও দৃঢ় করি। নিজ নিজ তালিবুল ইলমদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করি এবং নিজেরাও তাদেরকে সময় দেই। কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল হলে এবং সুযোগ থাকলে সোহবত হাসিলের ভিন্ন কোন বিভাগ চালু করি। আর যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশিষ্ট মাকাম দান করেছেন, তারা এর জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক কিছু সময় বের করি। এতে ইনশাআল্লাহ রিজাল তথা কর্মবীর তৈরি হবে।

অবশ্য ফারাগাতের পর সোহবত ওঠানো এবং যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি ব্যাপক ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং এর বহু দিক ও ধরণ রয়েছে। কেউ সোহবত অর্জন ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে অনুভূতিশীল হলে সব কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। উর্দুতে প্রবাদ আছে, 'মহব্বত তুঝে আ-দাবে মহব্বত সিখলায়েগী।'

অর্থ : অনুরাগ সৃষ্টি করো, সে-ই শিখিয়ে দেবে নিবেদনের কলাকৌশল।

তথাপি উদাহরণ হিসেবে ফারাগাত-পরবর্তী সোহবত ওঠানোর কয়েকটি দিক আলোচনা করা হল–

**ক.** মকতব, হিফয ও কিতাব বিভাগসহ সকল উস্তাদের প্রতি এমনকি স্কুলে দু'চার ক্লাস পড়ে থাকলে সেখানকার শিক্ষকদের প্রতি আজীবন ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। (এটি তালিবুল ইলম ও ফাযেল সবার জন্যই প্রযোজ্য) এ ব্যাপারে হযরত আলী রাযি.-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি হৃদয়পটে গেঁথে রাখি– 'যে কেউ আমাকে একটিমাত্র অক্ষরও শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার অনুগত দাস। চাইলে আমাকে বেচেও দিতে পারেন, আযাদও করে দিতে পারেন।'

দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে ব্যাপক গাফলতি পরিলক্ষিত হয়। কেউ তো ছোট-বড় কারও আদব-সম্মানের পরওয়া করে না। আর কেউ শুধু যাঁদের কাছে দাওরা-মেশকাত পড়েছে তাঁদেরকেই সম্মান করে, তাঁদেরকেই সালাম দেয়। মকতব-হিফযের ছোট ছোট (?) উস্তাদদের কথা তার মনে থাকে না।

**খ.** চিঠি-পত্র বা মোবাইলের মাধ্যমে সকল উস্তাদ ও মুরুব্বীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। মাঝেমধ্যে (বছরে অন্তত দু' চার বার) সশরীরে দেখা-সাক্ষাত করা।

**গ.** নিজের যে কোন দীনী-দুনিয়াবী জটিলতায় তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে অনুযায়ী আমল করা এবং তাঁদের দীনী-দুনিয়াবী পেরেশানীরও খোঁজ-খবর নেয়া।

**ঘ.** ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সংবাদ অবগত করে দু'আ চাওয়া এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের সংবাদও অবগত থাকা।

**ঙ.** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকালে আমাদের মুরুব্বীগণ তালিবে ইলমদের থেকে আর্থিক সেবাগ্রহণ পসন্দ করেন না। কিন্তু ফারাগাতের পর এ ব্যাপারে সাধারণত অনুমোদন থাকে। কাজেই আমার আসাতিযায়ে কেরাম, যারা দুনিয়ার বহু আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার খাতিরে বিসর্জন দিয়েছেন– সামর্থ্য ও সাধ্য অনুপাতে তাদেরকে আর্থিক সেবা দেয়া আমার কর্তব্য। বিশেষত আমার শিক্ষাজীবনের ভিত্তি রচনাকারী মকতব ও হিফযখানার উস্তাদগণ, যারা আমাকে উযূ-ইস্তিঞ্জা থেকে শুরু করে দু'আ-কালাম ও নামায-তিলাওয়াত শেখালেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা কি আমার দায়িত্ব নয়? তাদের বিপদাপদে বিনয়ের সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য নয়? মনে রাখতে হবে, এ দায়িত-কর্তব্য পালনে তাঁদের না যতটা উপকার হবে, আমার হবে শতগুণ বেশি।

হে সেদিনের সেই ছোট্ট তালিবুল ইলম! তুমি এখন বড় হয়েছো। বড় মাপের আলেম হয়েছো। চারদিকে তোমার সুনাম-সুখ্যাতি। পরিবার-পরিজন নিয়ে শহরে থাকো। মাদরাসায় পড়াও। ওয়ায-মাহফিল করো। জুমু'আ পড়াও। তাফসীর করো। ছোট-খাটো একটা ব্যবসাও আছে। তুমি কিন্তু আর্থিক অনটনের শিকার তোমার গ্রামের মহান উস্তাদজীকে ভুলতে পারো না, যেমন ভুলতে পারো না তোমার পিতা-মাতাকে। তোমার এ উস্তাদ তো তোমার

জন্য স্বর্ণের খনি। তারই দু'আয় তুমি গাঁয়ের মেঠোপথ মাড়িয়ে শহরের পিচঢালাই পথের সন্ধান পেয়েছো। তুমি কি পারো না, মাসে অন্তত একশত টাকা তোমার সেই মহান অনুগ্রহকারীর হাতে তুলে দিতে? বছরে একটি লুঙ্গি-গামছা তাকে হাদিয়া দিতে? তার অসুখ-বিসুখে কিংবা সন্তানের বিবাহের সময় হাজার কয়েক টাকা তার কাছে পৌঁছাতে! বিশ্বাস করো, এতে তোমার বাড়বে বৈ কমবে না!

একব্যক্তির কাছ থেকে শোনা– তিনি বলেন, 'একবার কোনও এক কাজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। দুপুর বেলা মাঠের একপ্রান্তে এক ভ্যানওয়ালার দোকানে যাই চা-বিস্কুট খেতে। দেখি কি! ভ্যানের সামনের টেবিলে বাবার বয়সী এক দাড়িওয়ালা ফকীর বসে আছেন। সাথে সম্ভবত তারই ছোট্ট একটি মেয়ে। দু'জনেরই মুখ শুকনো, মলিন। মনে হল কয়েক বেলা ধরে অনাহারে আছে। ফকীর আর তার বাচ্চাটির প্রতি খুব দয়া হলো। ভ্যানওয়ালাকে বললাম, ভাই! চাচা আর তার মেয়ে কি কি খেতে চায় দেন তো; বিল আমি দেবো। চাচা কিছু রুটি-কলা খেলেন, মেয়েকেও দিলেন। অতঃপর পানি পান করে কিছু না বলেই তিনি মুনাজাতের জন্য হাত উঠালেন। আমিও তার সঙ্গে হাত উঠালাম। তিনি কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলেন, আল্লাহ গো! এই দুপুর বেলা যে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করলো আপনি তাকে দুধে-ভাতে রাখেন, লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দেন...। আমার বিশ্বাস, সেই ফকীরের দু'আতেই আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক।'

প্রিয় তালিবুল ইলম! একজন অচেনা অজানা ফকীরের দু'আ যদি কবুল হতে পারে তাহলে তোমার সেই মকতব-হিফযখানার বুযুর্গ, তাহাজ্জুদগোযার উস্তাদের দু'আ কি কবুল হবে না? দু'আ কবুলের জন্য তো ঈমানও শর্ত নয়।

আমাদের উস্তাদ হযরত খুলনার হুযূর দামাত বারাকাতুহুম (আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্ত বালা-মুসীবত এবং তামাম ফিতনা ও ফাত্তান থেকে আফিয়াত নসীব করুন) ছুটিছাটায় বাড়িতে গেলে তার শৈশবের হিন্দু স্যারের সঙ্গেও নিয়মিত সাক্ষাত করতেন, স্যারকে হাদিয়া পেশ করতেন। এর ফলে তিনি স্যারের অনেক আশীর্বাদ পেয়েছেন।

আমাদের মুরুব্বী হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.-কে দেখুন। তিনি তার শৈশবের উস্তাদ 'গাংনী'র হুযূর রহ.-কে কেমন তা'যীম করতেন। উস্তাদজী যখন মাঝেমধ্যে রাহমানিয়ায় আসতেন তখনকার তা'যীম-খেদমত তো আমাদের নিজেদেরই দেখা। তাছাড়া উস্তাদজীর কয়েকজন সন্তান ও নাতিপুতিকে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে রাহমানিয়ায় পড়িয়ে হাফেয আলেম হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আমাদের অন্যান্য উস্তাদদের জীবনেও একই রকম ঘটনা পাওয়া যাবে।

শুনেছি, মাওলানা শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী রহ.ও তাঁর হিফযখানার এক দরিদ্র উস্তাদকে নিজ বেতনের একটা অংশ আজীবন হাদিয়া পাঠাতেন। এই হযরতগণ তো এ যুগেরই মানুষ। পূর্ববর্তী আকাবির হযরতগণও উস্তাদদের সঙ্গে এরকমই যোগাযোগ অব্যাহত রাখতেন।

কথাগুলো তালিবুল ইলম ও ফাযেলদের মন ভাঙ্গার জন্য নয়; চাঙ্গা করার জন্য আরয করা হল। আল্লাহ তা'আলা নিবন্ধের মূল আবেদনটি উপলব্ধি করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : সিনিয়র মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা


# মা'হাদু উলূমিল কুরআন ঢাকা

দ্বীনী ইলম শিখতে আগ্রহী সাধারণ শিক্ষিত যুবকদের জন্য ও ১৭ উর্ধ্ব বয়সের হাফেজদের জন্য মা'হাদু উলূমিল কুরআন ঢাকা এর নতুন উদ্যোগ

## বিশেষ কিতাব বিভাগ

ভর্তি শুরু ৬ শাওয়াল

দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী কুরআন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের জন্য

**আত্তাখাসসুস ফী উলূমিল কুরআন বিভাগ**

**ভর্তি:** ৬-৮ শাওয়াল, **পরীক্ষা:** লিখিত ও মৌখিক উভয়ভাবে হবে।

**লিখিত পরীক্ষার বিষয়:** তাফসীরে জালালাইন (সূরা বাকারা) ও আল-ফাউযুল কাবীর

গাইরে হাফেজ নবীন আলিম ও ১৭ উর্ধ্ব বয়সের যুবকদের কুরআন হিফজ করতে আগ্রহীদের জন্য

**বড়দের তাহফীজুল কুরআন বিভাগ**

১৫ শা'বান হতে নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি চলবে।

কলেজ-ভার্সিটির ছাত্র, চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের জন্য

**তাহসীনুল কুরআন বিভাগ**

(সহীহ কুরআন তিলাওয়াত ও জরুরী মাসায়িল শিক্ষা বিভাগ)

**ভর্তি শুরু:** ১০ শাওয়াল মুতাবেক ৫ জুলাই, **কোর্সের মেয়াদ:** ১২০ দিন

গাইরে হাফেজ তালিবে ইলমদের সহজে পবিত্র কুরআন হিফজ করার জন্য

**রমজান ভিত্তিক তাহফীজুল কুরআন**

**ভর্তি:** ১৫ শা'বান-১৯ শা'বান। দরস শুরু: ২০ শা'বান। **পরীক্ষা:** ২০ রমযান

**যোগাযোগের ঠিকানা:** ৯৪০/১৬, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, রোড নং-১৪, আদাবর, ঢাকা।
০২-৮১৯০১০৪, ০১৯৫০৮৪৩৩৯৬, ০১৭৯৫৬৮১১০৫

# জনদুর্ভোগ ও ভোগান্তির মাহফিল...

আবূ তোরাব মাসুম

এক.

আমি যে এলাকায় থাকি, এ অঞ্চলের অধিকাংশ ওয়াজ-মাহফিলে যতোটা না ধর্ম ও দাওয়াতের অনুষঙ্গ বিবেচ্য, তারচে' বেশি বিবেচনায় থাকে লোকজ সংস্কৃতি, বাৎসরিক এলাকাভিত্তিক বিনোদন ও একশ্রেণীর মানুষের জীবিকা নির্বাহের অনুষঙ্গগুলো। তবু যাত্রা-সংস্কৃতি, বাউল ও বয়াতী আসরের চেয়ে এ মাহফিল-সংস্কৃতি তুলনামূলক ভালো। তবে কথা হল, আমরা তুলনামূলক ভালোটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না; আমরা চাই তুলনামুক্ত নিখাদ দাওয়াতী মাহফিল। আলহামদুলিল্লাহ, পরিমাণে ক্রমশ তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্কৃতি ও প্রথাপ্রধান মাহফিলগুলো– যেখানে ভণ্ড বা চুক্তিবাদিরা নিমন্ত্রিত হন–সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী হয়? কালেকশন থেকে নিয়ে শব্দদূষণ, পারস্পরিক অহম ও হিংসাত্মক প্রতিযোগ থেকে নিয়ে বক্তার লজ্জাজনক চুক্তিসহ আরো কত কি! এগুলো সবারই জানা। আর এ জাতীয় মাহফিলপরবর্তী দীনি ফায়দা আসলে কতোটা সেটাও কারও অজানা নয়। তাই এ নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। মানে, নিজস্ব অঙ্গনের মনে না হওয়ায় গঠনমূলক কিছু বলার বা মধুর রাগ বর্ষণের দায় নেই, আবার বলে বা রেগেও তেমন লাভ নেই।

আমি আজকে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করবো এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুলে ধরবো ঐ শ্রেণীর একটি মাহফিলের ব্যাপারে, যে শ্রেণীটি আমাদেরই ঘরানার এবং যে শ্রেণীর মাহফিলগুলো নিখাদ দাওয়াতী মাহফিল হিসেবে বিবেচ্য; প্রথাপালন বা মিথ্যা অহম যেখানে লক্ষ্য নয়। এসব মাহফিলে হক্কানী আলেমরা নিমন্ত্রিত হন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন সবকিছু; উপরন্তু সেখানে আজগুবি বয়ান না হওয়ারও অঘোষিত প্রতিশ্রুতি থাকে। হ্যাঁ, আজ ক্ষোভ মূলত এমন হকপন্থি একটি মাহফিলকে নিয়েই। যার উপর হকের লেবেল লেগেছে তার মধ্যে কেন মোটা দাগের ত্রুটি থাকবে? সেই সঙ্গে তৃপ্তিরও দু'ফোঁটা কালি ঝরাবো একদিন পরের আরেকটি মাহফিলকে উদ্দেশ্য করে..!

দুই.

আমি খুব অসুস্থ ও দুর্বল। তারচে' বেশি দুর্বল প্রতীক্ষায় আছে কল্যাণপুর। তাই আমাকে বাধ্য হয়েই বাসে চড়তে হল। কিছু খাবার ও ওষুধ নিয়ে। বাস ফাঁকা রাস্তায় ছুটছে। গায়ে বাতাস লাগছে। আমিও যেনো দারুণভাবে শক্তি ফিরে পাচ্ছি। এলাকার বড় ব্রিজটি পার হওয়ার সময় দু'-দিগন্ত নিসর্গের ছোঁয়ায় প্রায়ই সুস্থ ও চাঙ্গা হয়ে উঠবো উঠবো করছি ঠিক তখনই বাস থেমে গেলো। ইঞ্জিন চালু। থপথপ কাঁপছে পুরো বাসের লক্কড়-ঝক্কড় বডি। সামনে পেছনে আরো অগণিত যানবাহন আমাদেরটার মতো কাঁপছে। ইঞ্জিনগুলো বিদঘুটে আওয়াজ তুলে দূষিত ধোঁয়া ছাড়ছে। ভাবলাম সামনের বাসস্ট্যান্ডে বাসচালকদের স্বেচ্ছাচারিতায় এই জ্যাম। স্ট্যান্ড পার হলেই আবার আমরা ছুটবো। যখন এটা ভাবছি, অনুভব করলাম আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে এবং ২০ মিনিটের মতো অপেক্ষা করে ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে। সবাই একটা করে গালি দিচ্ছে আর নেমে পড়ছে। কেউ কেউ বলছে, জায়েয আছে এটা?

আমি আগের চে' বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ঘামে পুনর্পৌনিক গোসল চলছে। তবু বসে আছি। এতোদূর হাঁটা আমার পক্ষে এ অবস্থায় সম্ভব নয়। এক ঘণ্টা বসে থাকলাম। বাসে আর কেউ নেই। বিজন ছিনতাইয়ের পরিবেশ। অগত্যা নেমে হাঁটা শুরু করলাম। বেশ কয়েকবার মানবজ্যামের কারণে স্থির দাঁড়িয়েও থাকতে হয়েছে। সবগুলো মানুষের মুখে মৃদু ডিগবাজি খাচ্ছে ঘাম। আসছে উৎকট গন্ধ। এখানেও পুরো পথে শুনতে হলো সেই গালি ও সেই প্রশ্ন– এসব জায়েয আছে? মানুষগুলোর কী ভয়াবহ ভোগান্তি হচ্ছে? অনেকে বলছিলো, ওখানে গেলে কোন সওয়াব হবে না; পাপ হবে!

চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যখন পৌছলাম, তখন মহাসড়কতুল্য নগরীর অন্যতম ব্যস্ত সড়কটির একদিক সম্পূর্ণ আটকে দিয়ে নির্মিত বিশাল প্যান্ডেলের নিচে মুসল্লিরা দাঁড়াচ্ছেন মাগরিবের নামাযের জন্য। শরীক হতে গিয়েও ফিরে এলাম। যে মাহফিলের উপর এতো এতো মানুষের এতো এতো গালি, যার প্রতি বদ-দু'আর হাজারো তীর বর্ষণ, যার কারণে এই অসুস্থ আমি এতো কষ্ট পেলাম, সেখানে নামায পড়বো না। যদিও নামায পড়লে আদায় হয়ে যাবে এবং আমাদের মতো সর্বসাধারণরা সওয়াবও পেয়ে যাবে। তবু রাগ তো রাগই; এখানে যুক্তি চলে না।

আশেপাশে বড় বড় মাঠ ছিলো; সেখানে বা কোন গলি-রাস্তায়ও তো হতে পারতো। ক্ষমতার অপব্যবহারে কি কোন আনন্দ আছে? ক্ষমতা সত্ত্বেও সেক্রিফায়েসের মধ্যে জেনেছি জান্নাতী সুখ। যে কেউ চেখে দেখতে পারেন। একটা হকপন্থি মাহফিলের আয়োজকদের থেকে এমনটি মোটেও প্রত্যাশার ছিলো না। রাজনৈতিক সভাসমাবেশ হলেও কোন অভিযোগ করতাম না। কারণ সেখানেও কিছু বলার শক্তি নেই আমাদের। উপরন্তু প্রকৃতিগতভাবেই রাজনীতির সাথে মিশে আছে স্বেচ্ছাচারিতা।

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা সঙ্গত মনে করছি, এই একটি মাহফিলকে নিয়েই যে অভিযোগ, এমন নয়; যেখানেই এমন নৈরাজ্য সেখানেই আমার ও সবার এই 'বিদ্বেষমুক্ত' অভিযোগ। বিদ্বেষমুক্ত বললাম, কারণ মৌলিকভাবে কেউই মাহফিলবিরোধী নয়; সবাই চায় সহীহ মাহফিল হোক, বেশি বেশিই হোক।

তারপর ক্ষোভ কোন ব্যক্তির উপর নয়। আমি নিজে এবং আমার সামনে একটি বৃহৎ জনজীবন তীব্র ভোগান্তির শিকার হয়েছে, সে জন্যই এই ক্ষোভ। নতুবা আমি বিশ্বাস করি, মাহফিলের প্রধান মেহমান, যিনি একজন প্রথিতযশা আলেম, নিশ্চিতভাবেই তিনি এমন ব্যবস্থাপনা পছন্দ করেননি। মন্ত্রী সাহেবও হয়তো এভাবে নির্দেশ দেননি। কিন্তু ঐ যে! পাতি নেতারাই যে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে!

কয়েক বছর যাবতই এভাবে রাস্তা দখল করে উক্ত মাহফিলটি চরম ভোগান্তির সৃষ্টি করছে। আশা করবো, অন্তত হকপন্থি এবং চুক্তি ও কুপ্রথামুক্ত সকল মাহফিল এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত থাকুক। তাহলে ফায়দা আরো ব্যাপক হবে।

তিন.

এর এক বা দু' দিন পরেই আমাদের বাসার কাছে একটি মাহফিল। কী মনে করে এবার এই মাহফিলে যেতে আগ্রহ হলো। (১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# প্রিয় মুখ প্রিয় স্মৃতি

**ওবায়েদ আহমাদ**

ছোট্ট পা ফেলে মকতবে যাই। পরম মমতায় বুকে আগলে রাখি রেহাল। কালো হরফে হাত রেখে উস্তাদজীর সাথে পড়ি– আলিফ, বা, তা। বিকেলে ছুটি হয়। দলবেঁধে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসি মাঠে। কোনদিন দালানের কোণে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ে কান ধরে উঠবস করেছি। কোনদিন বরফপানি, সাতচাড়া, কাবাডি খেলে সময় কাটিয়েছি। কোনদিন আবার যেতাম ভূতের বাড়ি। অন্ধকার বাড়ির লম্বা করিডোর ধরে এক পা এগুতেই দেখতাম মানুষের মতো কেউ ধরতে আসছে। দু'দণ্ড দাঁড়ানোর কথা ভাবলেই গা ছমছম করতো। পাশের খাল ভরাট করে গড়ে উঠা বালুমাঠে ক্রিকেট আর ফুটবল দারুণ জমতো। শীতে ব্যাডমিন্টন, ঘুড়ি উড়ানো, আরো কত কি!

উস্তাদগণ আমাদের ভীষণ ভালোবাসতেন। প্রিয় দু'জন উস্তাদ ছিলেন হাফেয জসীম সাহেব আর হাফেয আবূ সাঈদ সাহেব। সাত বছর পড়াশোনার পর উস্তাদগণ আমাদের বিদায় দিতে নারায ছিলেন। সবচে' বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন হাফেয জসীম সাহেব হুযূর। বিদায়কালে আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বললেন, বাবা! রেখে দে, সময় হলে খরচ করিস। হু হু করে কেঁদে ফেললেন হুযূর। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে। অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে চোখ। সেই টাকাটা আর খরচ করতে পারিনি। পরম মমতায় আগলে রেখেছি উস্তাদজীর দেয়া শেষ মমতাটুকু। এভাবে অদ্ভুত সব বিশ্বাস আর ভালোবাসা নিয়ে গড়ে উঠেছিল আমাদের শৈশব। দারুস সালামের সেই ফেলে আসা দিনগুলো এখনো মনে পড়ে।

# # #

পরের বছর চলে এলাম মালিবাগ জামি'আয়। এই প্রথম কওমী মাদরাসার আঙিনায় আমি। কাজী সাহেব হুযূর তখন বেঁচে ছিলেন। ছোট জামাআতে অধ্যয়নকালীন শখ করে হুযূরের দরসে বসেছি বহুবার। বুখারীর দরসের চেয়ে তখন আপন মনে হতো হুযূরের সান্নিধ্য। আনকোরা বালকের মতো চেয়ে থেকেছি হুযূরের মুখের দিকে। উস্তাদগণ ছিলেন খুব অমায়িক। সাহিত্যসাধনায় অনেকেই ছিলেন অগ্রজ সারির। আমার কাছে সপ্তাহের সেরা দিনটি ছিল সাহিত্য মজলিস। আকর্ষণীয় 'মজলিস এলান' সাঁটা হতো নির্দিষ্ট দিনে। আমরা দশ-বারোজন নিয়মিত সেই মজলিসগুলোতে হাজির হতাম। প্রতিটি মজলিসেই স্ব-রচিত লেখা পাঠ হতো। বার্ষিক সাহিত্য প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে 'বর্ষসেরা লেখক' পুরষ্কার পেয়ে অভিভূত হওয়ার স্মৃতি আজো আমাকে সাহিত্যের পথে রসদ যুগিয়ে চলছে। জামি'আর বক্তৃতা মজলিসগুলো ছিলো আরো আকর্ষণীয়। ৭টি ফরীকে বিভক্ত ২৫ জনকে প্রতিটি সপ্তাহেই বক্তৃতা দিতে হতো। শিক্ষামূলক এই আসরগুলো আমার জীবন গঠনে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। কাফিয়ার বছর রমাযান মাসে চলে গেলেন আমাদের কাজী সাহেব হুযূর রহ.।

# # #

শরহেবেকায়া পর্যন্ত মালিবাগে পড়লাম। মালিবাগ ছেড়ে আসার দিনটি আজো স্মরণীয়। ভর্তির শেষদিন পর্যন্ত নায়েবে মুহতামিম সাহেব হুযূর আমার জন্য ভর্তিফরম রেখে দিয়েছিলেন। মরহুম মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহইয়া সাহেব রহ. মন্তব্য করেছিলেন, 'ওকে আমি নিজের মত করে গড়তে চাচ্ছিলাম। আজ ও না বলে চলে গেল!' জামি'আর সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতী হাফিজুদ্দীন সাহেব জানতে চাইলেন, আমি কেন মালিবাগ ছাড়তে চাচ্ছি। সুদীর্ঘ সাত বছরের স্মৃতি বিজড়িত জামি'আকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছিল।

অবশেষে মালিবাগ ছেড়ে রাহমানিয়ায় জালালাইন জামাআতে ভর্তি হলাম। জামি'আতুল আবরারের নতুন পরিবেশে আমাদের থাকার সিদ্ধান্ত হলো। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। দিগন্তজোড়া কাশফুলে ছাওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এ বছরই ১০তলা শিক্ষাভবন 'কসরুল আশরাফ' এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

সর্বপ্রথম পরিচয় হলো মোমেনশাহীর আশরাফ কবির ভাইয়ের সাথে। নতুন ছাত্র হিসেবে আমার প্রতি কবির ভাইয়ের আন্তরিকতা আর সহযোগিতা আজো ভুলতে পারিনি। দরসের শুরুদিন থেকেই উর্দূতে তাকরীর শুরু হয়। উর্দূর জন্য বেশ বেগ পেতে হয়েছে। মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহেবের সহযোগিতায় দু'মাসেই উর্দূটা রপ্ত করতে পেরেছি। এ বছর আমাদের নিগরান ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ সাহেব দা.বা. আর হযরত মাওলানা ক্বারী মুনীরুয্যামান সাহেব হুযূর। নিয়মানুবর্তিতায় ক্বারী সাহেব হুযূর ছিলেন কঠোর। সাড়ে দশটার আগে বিছানায় পিঠ লাগানো মাদরাসার কানুনের একটি। হুযূরের সজাগ দৃষ্টি আর পিতৃসুলভ শাসনের কারণে সবাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শুয়ে পড়তো। অন্য জামাআতের ছাত্রদের নিয়মমাফিক শুয়ে পড়ার বিষয়টি জোরদার করতে হুযূর তদারকীর দায়িত্বটা আমাদের কয়েকজনের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

এ বছর বার্ষিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় উপস্থাপক দলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জামি'আর সাথে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলাম। অনুষ্ঠান শেষে হযরত মাওলানা রফীকুল্লাহ মাদানী সাহেব বললেন, 'তোমার উপস্থাপনা অনেক ভালো লেগেছে'। অদ্ভুত ভালো লাগায় শ্রদ্ধাবনত হই। হুযূর এতো ঘনিষ্ঠভাবে আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করেন। সপ্তাহের

সেরা দু'টি দিন ছিল আমাদের কাছে মুফতী সাহেব হুযূরের মজলিসের রবিবার দিন আর মুমিনপুরী হুযূরের মালফূযাত পড়ার মঙ্গলবার দিন। আমাদের মুরুব্বীরা সত্যিই আমাদের কল্যাণ সাধনায় অনেক চেষ্টা করেন, ত্যাগ স্বীকার করেন।

# # #

মিশকাত জামাআত রাহমানিয়া টিনশেডে পড়া হলো। দক্ষিণে দু'টো সিঁড়ি আছে প্রবেশের জন্য। মূল সড়কের ছ'ফুট নিচে অবস্থিত মাদরাসার পূর্ব পাশের লম্বা করিডোর ধরে হাঁটলেই চোখে পড়ে বহু গলি। ভুলে নিজের কামরা মনে করে অন্যের কামরায় ঢুকে পড়েছি অনেকবার। টিন বাঁধানো ছাদের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। প্রচণ্ড গরমে ঝলসানো টিনের উত্তাপে ঘেমে জবুথবু হই। শীতের প্রচণ্ডতায় মনে হতো জমে বরফ হয়ে যাবো। তবে এখানে পৃথক কামরায় আবাসন ব্যবস্থাটা চমৎকার। মুফতী সাহেব আর মুমিনপুরী হুযূরের দরস আমাদের জন্য ছিলো সৌভাগ্যের বিষয়।

আমাদের নিগরান নায়েব সাহেব হুযূরের সান্নিধ্য ছিলো পিতা-পুত্রের মতো। শাসনের চে' স্নেহটাই বেশি পেয়েছি। তাই কষ্টের দিনগুলো এখানে আনন্দেই কেটেছে। বছরের শেষের দিকে মিশকাতের দরসে মুফতী সাহেব হুযূর রাহমানিয়া খুদ্দামুত্তুলাবার গুরুদায়িত্ব আমার দুর্বল কাঁধে অর্পণ করলেন।

# # #

দাওরাতুল হাদীস এখানেই সমাপ্ত হলো। এ বছর নিগরান ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দা.বা. আর ক্বারী সাহেব হুযূর। রাহমানিয়া খুদ্দামুত্তুলাবার সুবাদে জামি'আর রূহানী আত্মায় একাত্ম হয়ে মিশে গেলাম। রাহমানিয়া খুদ্দামুত্তুলাবার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ছুটির সময়গুলোতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা ছিলো বেশ জটিল। ১৬ ডিসেম্বর ৪জন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ছুটিতে ছয়দিন ব্যাপী ভূমি জরিপ প্রশিক্ষণ, ১৪ ফেব্রুয়ারি রাহমানিয়া খুদ্দামুত্তুলাবার ৩০ সালা অনুষ্ঠানগুলো ছিলো রীতিমতো দুঃসাহসিক। অনুষ্ঠানগুলোকে সুন্দর আর প্রাণবন্ত করতে আমাদের শ্রম, ঘাম আর অর্থ যোগানের বিষয়টি ছিলো পর্দার পেছনের গল্প।

খুদ্দামুত্তুলাবার কার্য পরিচালনার মধ্য দিয়ে হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসঊদ সাহেব দা.বা.-এর কাছে চিরঋণী হয়ে পড়লাম। হযরতের উদার মানসিকতা আর সৃজনশীল কর্মভাবনা আমাদেরকে নবউদ্যমে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতো। হযরত মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান সাহেবের দিকনির্দেশনা আমাদের কর্মচিন্তায় দিয়েছিল নতুন গতি। কর্মবিন্যাস পদ্ধতি আরো বিস্তৃত করলেন হযরত মাওলানা শফীক সালমান সাহেব।

এ সময় একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে পেলাম মোমেনশাহীর আব্দুর রহমান আর যশোরের সাঈদ ভাইকে। অনুষ্ঠানগুলোকে আকর্ষণীয় করতে বর্ণিল ব্যানার, ফেস্টুন আর ব্যাজ নিয়ে হাজির হতেন প্রকাশনা বিভাগের সিবগাতুল্লাহ ভাই। দফরত বিভাগের হাবীব ভাইকে দেখেছি শত শত সদস্যের পুরষ্কারের বই মলাটের কাজে নির্ঘুম রাত কাটাতে। মাইকের সাউন্ডসিস্টেম সচল রাখতে গলদঘর্ম হতেন মোমেনশাহীর নাঈম ভাই। আর অর্থ বিভাগের হিসেবের খাতায় তাওফীক ভাইয়ের কর্মকুশলতা ছিলো অভিনব। হামদ-নাতে সবসময় আমাদের মুগ্ধ করতেন সংস্কৃতি বিভাগের ইউসুফ ভাই। সাহিত্যের টানেই কিনা পরিচিত হলাম কুমিল্লার লোকমানের সাথে। এখনো চোখে ভাসে বক্তৃতা মজলিসগুলোতে যাহিদ ভাই আর আব্দুল আলীমের ছুটোছুটি। আরবী সাহিত্যের দেয়ালপত্রিকায় অসাধারণ সব চমক দেখিয়ে আমাদের চমকে দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ বিন কারামাত ভাই। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন সাতক্ষীরার আশিক ভাই। রকমারি বইয়ে ঠাসা পাঠাগার কি আমাদেরকে আশিক ভাইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে? দাওয়াতুল হকের মজলিসগুলোতে ব্যস্ত দেখতাম মুহাম্মাদ বিন ফারূক আর শরীয়তপুরের আব্দুল্লাহ ভাইকে। কর্মযজ্ঞের বিশাল মহড়া ছাপিয়ে আজ দু'টি নাম বেশি মনে পড়ছে– শফীউল আলম ভাই আর মুহাম্মাদুল্লাহ ভাই। কোন কাজে না বলতে শুনিনি মাগুরার হুসাইন ভাইকে। শত ঘটনা আর অঘটনের মধ্য দিয়ে এ বছরটি ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম আর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় ঠাসা।

# # #

অনেক স্মৃতি আজ হৃদয়ে ভাসছে। আমরা ছেড়ে যাচ্ছি আমাদের প্রিয় দিনগুলো, প্রিয়তম মুখগুলো। শত স্মৃতিবিজড়িত প্রাণপ্রিয় জামি'আকে বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়া বিদায়ী কাফেলার দৃশ্যগুলো বহু পুরনো। কিন্তু আমাদের বিদায়ী কাফেলার জন্য এটা নতুন এক অধ্যায়। এ বিদায় বেদনার, এ বেদনা বিরহের, এ বিরহ প্রিয় হারানোর শঙ্কায়। আমাদের আগে চলে গেছে বহু কাফেলা। অসংখ্য শুষ্ক পদচ্ছাপ লেপ্টে আছে সেই পথে। আঁখির তপ্ত নীরে সিক্ত বিদায়ী কাফেলার রেখে যাওয়া অগণিত পদরেখা আজ আমাদেরকে আয় আয় বলে ডাকছে। সম্মোহিতের মত আমরা ক'জন হাঁটি অজানা গন্তব্যের দিকে। অস্পষ্ট ঝাপসা চোখে পেছন ফিরে তাকাই। অস্ফুট কান্নাচাপা কণ্ঠে বলি, 'বিদায় জামি'আ'। প্রতিধ্বনির মত ফিরে আসে কানে। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসে, বিদায়! বিদায়!!

# 'রাবেতা' পঙ্ক্তিমালা

**মুহাম্মাদ জুনাইদ আল-আযাদ**

কিভাবে যে সফরটা শেষ হয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। কখন যে জীবনের এতোটা সময় পার হয়ে গেলো ঠাহর করতে পারলাম না। হঠাৎ শুনি বেজে উঠেছে বিদায়ঘণ্টা।

বিদায় মানুষকে কষ্ট দেয়। বিদায় সম্পর্কে ফাটল ধরায়। বিদায় পরিচিতকে অপরিচিত করে দেয়। বিদায় ভালোবাসায় ঘাটতি এনে দেয়। বিদায় মানুষকে কাঁদায়, শুধুই কাঁদায়!

এ ইলমী সফরে আমরা সকলেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। হাসি-খুশি, দুষ্টুমি আর খুনসুটিতে কাটিয়েছি পুরোটা সময়। মাঝেমধ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে। পরক্ষণেই সব কিছু ভুলে গিয়ে শরীক হয়েছি একই

দস্তরখানে। এটুকু হতেই পারে। তাই বন্ধু হে! কখনো ভুলে যেও না। আমিও ভুলবো না তোমাদের। সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবো; কভু পিছু হটবো না, ইনশাআল্লাহ।

যদি কখনো কোন কারণে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাও তবে ভয় পেয়ো না; তোমাকে হাত ধরে তোলার মত আছে অনেকগুলো হাত। তুমি কখনো কোন কাজে সাহস হারিয়ো না; তোমাকে সাহস যোগাতে আছে বিশাল রাহমানী কাফেলা– রাবেতায়ে আবনা। এসো না, মতভেদ ভেদাভেদ ভুলে একদেহ হয়ে কাজ করি আজীবন।

বিদায় শব্দটিতে আগে আমার খুব ভয় ছিল। ভয় ছিল সম্পর্ক ছিন্নতার। ভয় ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার। এখন আর সে ভয় নেই। কারণ আমাদের বড়রা গঠন করেছেন 'রাবেতা'; সম্পর্ক স্থাপনের এক সেতুবন্ধ। রাবেতা ভালোবাসার নাম। রাবেতা সম্পর্ক স্থাপনের নাম। রাবেতা কাছে টানার নাম। রাবেতা সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার নাম। রাবেতা এক মিলনমেলার নাম। হে আল্লাহ! তোমার কাছে সকরুণ মিনতি, রাবেতাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো চিরকাল।

# বিদায়ের নোনাজলে

**মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

জাগতিক কোন শিক্ষা নিকেতনে যাইনি। মাড়াইনি স্কুল-কলেজের পথ। সাড়া দেইনি পার্থিব হাতিছানির। ছুটিনি মরীচিকার পেছন। কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য আপন করে নিয়েছি ইলমে দীনকে। ওহীর বাণী ও রিসালাতের অমীয় সুধা পান করতে এসেছিলাম এ ইলমী কাননে। আজ বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়ে নিতে হচ্ছে বিদায়।

বিদায় নিতে চাহে না মন,
তবুও এসেছে বিদায়ের ক্ষণ।

নিষ্ঠুর এ বিদায়লগ্নে ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছি। বুকভরা আশা নিয়ে মৌমাছির মত ছুটে এসেছিলাম এ মহুয়া বনে। অনেক পেয়েছি, কিন্তু অযোগ্যতাবশত নিতে পারিনি কিছুই। একেবারেই বঞ্চিত হয়েছি তা-ও নয়। প্রাণপ্রিয় রূহানী পিতারা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত করতে কার্পণ্য করেননি। আমাদের জীবন গড়তে তারা করেছেন অক্লান্ত সাধনা। কেবল অঞ্জলি ভরেই দেননি; দিয়েছেন মন উজাড় করেও। তাদের আদর-যত্ন, মায়া-মমতা পিতা-মাতার চেয়ে কম ছিলো না। শাসন ও নিয়ম-কানুন ছিলো রহমত আর কঠোরতা ছিলো আশীর্বাদ।

মানিনি আদেশ, শুনিনি নিষেধ; তবুও বিরক্ত হননি, তাড়িয়ে দেননি। আজ হাত জোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী সকল অবাঞ্ছিত, অমার্জিত ও অন্যায় আচরণের জন্য। দু'আ চাচ্ছি, যেন তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও আমানত পৌঁছে দিতে পারি জাতির দোর-গোড়ায়। আমাদের ভবিষ্যত যেন হয় সূর্যের মত উজ্জ্বল, আমাদের জীবন যেন হয় হিরা-জহরতের মত চমকপ্রদ–এটাই একান্ত প্রত্যাশা ও মনোবাঞ্ছা।

পরিশেষে হে প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ! যে জীবন দাঁড়িয়ে আছে ভুলের হিমালয়ে, তার কাছে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা। মিষ্টি বচন, সুমিষ্ট আচরণে তোমাদের সিক্ত করতে পারিনি। পারিনি আদর-স্নেহ, প্রীতি-মায়ার বাহুডোরে বাঁধতে। সর্বদা করেছি অসংযত ও অন্যায্য আচরণ। আজ হাত দু'টি বাড়িয়ে দিলাম, ক্ষমা করে দাও। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দু'আ করি, আমাদের চলার পথ হোক সুগম। আমাদের ভবিষ্যত হোক উজ্জ্বল। আমাদের জীবনপ্রবাহ হোক সুরভিত। বিদায় হে বন্ধুরা! বিদায়!!

# হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা

**মুহাম্মাদ মুবাশ্বির আহমাদ**

স্বপ্নের তুলিতে আঁকা, মায়া-মমতায় ঘেরা সুন্দর এ বসুন্ধরা। যখন পাপ আর পঙ্কিলতায় গোটা সমাজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত, পাগলপারা মানবতা যখন শান্তির আশায় ব্যাকুল হয়ে খুঁজছে কোন আশ্রয়, শান্তি নামের শ্বেত পায়রাগুলো যখন হারিয়ে গেছে দূর অজানায়, হতাশা, নিরাশা ও দুরাশা যখন অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে তখন চারদিক থেকে উমরী হিম্মত বুকে ধারণ করে নববী শিক্ষার বিস্তার ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে একঝাঁক উচ্ছ্বলপ্রাণ তরুণ জড়ো হয়েছিল জামি'আ রাহমানিয়ার ইলমী কাননে।

জামি'আর ছাত্র-শিক্ষকসহ প্রতিটি অণু-পরমাণুকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল মায়া-মমতা আর ভালোবাসার এক সৌধ। হৃদয়ের এ বন্ধন কখনো টুটে যেতে পারে, আসতে পারে বিদায় বিচ্ছেদের কোন কালবোশেখী ঝড়, তা ছিল কল্পনার অতীত। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্যাকাশে জমে উঠেছে মেঘের কালো আস্তরণ, বিচ্ছেদের পূর্বাভাস চতুর্দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আসছে বিদায়। তাই ভিজে উঠেছে চোখের দু'টি কোণ, ঝরে পড়েছে ক'ফোঁটা অশ্রু। কে দিবে তাদের সান্ত্বনা? আজ সত্যিই যেন জীবনের অনেক বড় কিছু হারানোর ভয়। বেদনায় জর্জরিত প্রতিটি প্রাণ।

হে পিতৃতুল্য আসাতিযায়ে কেরাম!

সূর্যের আলো দেখেছি, জোৎসনার আলো মাড়িয়েছি, ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু কোন আলোই জীবনের পূর্ণতা দেয়নি, তৃপ্তি খুঁজে পাইনি কোথাও; যতটা পেয়েছি আপনাদের কোলে এসে। পরশপাথর কাছে পেয়েও নিজেকে মেলে ধরিনি আপন করে। আপনারা স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে যে মায়া-মমতার সেতুবন্ধ তৈরি করেছেন তার বিনিময় কি দিয়ে দেব তা আমাদের জানা নেই। তাই তা আজ হাওয়ালা করলাম আল্লাহর উপর– তিনিই দিবেন উত্তম প্রতিদান।

হে মাতৃতুল্য জামি'আ!

আমরা যখন সময়ের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম কাণ্ডারীহীন নৌকার যাত্রী হয়ে, মাথা গোঁজার মত কোন আশ্রয় যখন আমদের ছিলো না, তখনই তুমি আমাদের গ্রহণ করেছিলে আপন করে। আর কি এক রত্ন ভাণ্ডারে ভরিয়ে দিয়েছো আমাদের মনপ্রাণ। কলবে দিয়েছো ইলমের ফোয়ারা। কিন্তু আজ তুমি বাস্তবতার শিকার হয়ে আমাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছো। তবে হৃদয়ের টানে কখনো তোমার দুয়ারে এলে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। একযুগ বুকে ধারণ করেছো; পারবে না আগামীতেও ; দু'দণ্ড আশ্রয় দিতে?

প্রিয় সাথীবৃন্দ ও অনুজ বন্ধুরা!

দীর্ঘ সময় তোমাদের সাথে থেকেছি। চলনে-বলনে অনেক অসঙ্গত আচরণ হয়েছে। আজ বিদায়কালে আমাদের ক্ষমা করে দাও। যুগ-যুগান্তের ঘূর্ণিপাকে কখনো যদি মুখোমুখি হয়ে যাই, চোখ দু'টো নামিয়ে ফেল না। অচেনার ভান করে চলে যেও না। কুসুম-সুবাসে ভরে উঠুক তোমাদের হৃদয়। আল-বিদা! আল-বিদা!!